Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারীবাদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিয়া আক্তার

রোলঃ 227020416

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারীবাদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিয়া আক্তার

রোলঃ 227020416

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নারীবাদ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানিয়া আক্তার , আইডিঃ 227020416 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নারীবাদ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tania Akter

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তানিয়া আক্তার

আইডিঃ 227020416

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

নারীবাদের সূচনা 1

ফেমিনিস্টদের উপেক্ষিত ইতিহাস 2

নারীবাদীদের স্লোগান 8

নারী নেতৃত্ব 13

প্রশাসনে নারী অবস্থান আন্দোলন জুলুমতন্ত্রকেই শক্তিশালী করে 15

ক্ষমতা অধিকার নয়, দায়িত্ব 17

পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কে তিনটি মিথ 18

সাহিত্য ও পপ কালচারে নারীবাদ ও ইসলামবিদ্বেষের ভয়াল রূপ 23

রিদ্দার পথে একজন মুসলিম ফেমিনিস্টের যাত্রা 25

নারীবাদ কি মুসলিম নারীদের ইসলামত্যাগের কারণ 31

মুসলিম নারীবাদ : উপনিবেশবাদের পদচিহ্ 34

সিস্টেমের উপযোগ বনাম ইসলামে সম্মান 39

নারীবাদীরা সেক্যুলার সিস্টেমের পণ্য 40

পশ্চিমের পুতুল মালালার বিষাক্ত নারীবাদ 42

আফগান নারীদের জন্য শেতাঙ্গদের কান্ন 45

যখন সিলেক্টেভ মানবতা উপচে পড়ে 47

মাতৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ: মুসলিম নারীবাদের অবস্থান 48

তাঁরা চার 49

নারীশিক্ষা 52

নারীর চাকরি 54

পুরুষের বহুবিবাহ: নারীর স্বার্থহানি নাকি স্বার্থপ্রতিষ্ঠা? 56

নারীবাদীদের থেকে মুক্তি পেতে আমাদের করণীয় 70

রেফারেন্স 75

নারীবাদ বিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত একটি আন্দোলন যা নারীর ক্ষমতায়ন, ভোটদানের অধিকার এবং নারী পুরুষ সমান এই দাবী থেকে শুরু হয়।

কালের পরিক্রমায় অনেক নারীবাদী আন্দোলন এবং আদর্শ তৈরী হয়েছে যেগুলোর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এবং লক্ষ্য উপস্থাপন করে। এর মাঝে কতগুলো ধারা সমালোচিত হয়েছে যেমন, নাগরিক অধিকার আন্দোলন বা বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন যেগুলোকে বলা হয় যে, এগুলো শুধু সাদাদের, মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কথা তুলে ধরে। এই সমালোচনা থেকে পরবর্তীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কেন্দ্রীক নারীবাদের সূচনা হয় যার মাঝে কালো নারীবাদ এবং ইন্টারসেকশনাল নারীবাদ অন্তর্ভুক।

নারীবাদের সূচনা

১৮৩৭ খ্রিঃ ফরাসি দার্শনিক ও ইউটোপীয় সমাজবাদী চার্লস ফুরিয়ে প্রথম 'নারীবাদ' শব্দটির আনুষ্ঠানিক ব্যবহার করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। "নারীবাদ" (feminism) এবং "নারীবাদী" (feminist) শব্দ দুটি ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে। যুক্তরাজ্যে ১৮৯০ এ, এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১০ সালে। অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান অনুযায়ী "নারীবাদী" শব্দের উৎপত্তিকাল ১৮৫২এবং "নারীবাদ" শব্দের ক্ষেত্রে তা ১৮৯৫। সময়কাল, সংস্কৃতি ও দেশভেদে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নারীবাদীরা বিভিন্ন কর্মসূচি ও লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করেছেন। অধিকাংশ পাশ্চাত্য নারীবাদী ঐতিহাসিক মনে করেন যে যে সমস্ত আন্দোলন নারীর অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করেছে তাদের সব কয়টিকেই নারীবাদী হিসেবে গণ্য করা উচিত; তারা নিজেদেরকে ঐ নামে চিহ্নিত না করলেও এর অন্যথা হয় না। অন্য ঐতিহাসিকরা মনে করেন 'নারীবাদী' শব্দটি শুধু আধুনিক নারীবাদী আন্দোলন ও তার উত্তরসূরি আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই দ্বিতীয় দলের ঐতিহাসিকরা পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলোকে চিহ্নিত করতে "উপনারীবাদ" কথাটির অবতারণা করেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য নারীবাদী আন্দোলনের ইতিহাস তিনটি "তরঙ্গ"-এ বিভক্ত। নির্দিষ্ট কিছু নারীবাদী লক্ষ্যের এক একটি আঙ্গিক নিয়ে এক একটি ঢেউ কাজ করেছে। প্রথম ঢেউ-এর সময়ে, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রথম ভাগে নারীর ভোটাধিকার অর্জনের উপর জোর দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ঢেউ বলতে ১৯৬০ এর দশকে নারীমুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হওয়া মতাদর্শ ও কর্মসূচীসমূহকে বোঝায়। এই সময়ে নারীর সামাজিক ও আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়। তৃতীয় তরঙ্গ হল দ্বিতীয় তরঙ্গের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ১৯৯০ এর দশক থেকে শুরু হওয়া একটি ভিন্ন অভিমুখী ধারাবাহিকতা।এই পর্যায়ে লিঙ্গনির্ভর প্রথাগত সামাজিক মূল্যবোধের একাধিক আমূল পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে ও হচ্ছে।

ফেমিনিস্টদের উপেক্ষিত ইতিহাস

নারীবাদী আন্দোলনের অস্তিত্ব না থাকলে নারীরা আজকে যেসব অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, সেসব থেকে বঞ্চিত হতো-এই ধরনের একটা তথ্য ফেমিনিস্টরা মিডিয়ার মাধ্যমে দিনরাত ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাদের মতে একটি দীর্ঘস্থায়ী পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ফলে নারীরা অর্থনৈতিক ও অ্যাকাডেমিক সফলতাসহ সর্বত্র বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আসছিল। সত্যিই কি তা-ই? বাস্তবতা বলে-ব্যাপারটা মোটেই সে রকম নয়; বরং নারীবাদীদের এই দাবি শতভাগ বানোয়াট। ফেমিনিস্টরা এক্ষেত্রে ইতিহাসের ওপর গুরুত্বারোপের বিষয়টি সর্বদা উপেক্ষা করে পালিয়ে বেড়ায়। কারণ, নারীদের ওপর একতরফা পুরুষতান্ত্রিক নির্যাতনের এই দাবি ইতিহাসের বাটখারায় একেবারেই উত্তীর্ণ নয়; বরং ইতিহাস ঘাঁটলে আপনি দেখতে পাবেন-আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও আগে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষের চেয়েও বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিল নারীরা। ইতিহাসে এ রকম ভূরিভূরি ক্ষমতাশীল নারী রয়েছেন-যাদের এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এখানে অল্প কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরব -নারীবাদীরা কীভাবে তাদের নির্যাতন-নিপীড়নের মিথ্যা কাসুন্দি ঘেঁটে যাচ্ছে। কীভাবে প্রতারণাপূর্ণ শঠতায় প্রভাবিত করছে ইতিহাসের বয়ান। আমাদের প্রথম উদাহরণ আফ্রিকার দেশ মিশর থেকে। প্রাচীন শাসকদের মধ্যে মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা ছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত।

প্রকৃতপক্ষে মিশরের সাতজন রানির নাম ছিল ক্লিওপেট্রা। যদি সেখানে আদৌ পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থাকত, তাহলে সাতজন রানির মধ্যে কেউই মিশরের সর্বোচ্চ শাসক হতে পারতেন না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো- উক্ত সাতজন ছাড়াও আরও অনেক রানি পেয়েছিল মিশর। বলা দরকার, দেশটি বরাবরই ছিল নারী শাসকদের জন্য সুবিদিত। মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের পঞ্চম ফারাও হাতশেপসুত ছিলেন একজন নারী। ১৪৭৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেন। আবার স্বামীর সাথে যৌথভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন রানি তিয়ে।

শোনা যায়, এই ক্ষমতাবান নারীর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা এতটাই বেশি ছিল যে, বিদেশি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা রাজার তুলনায় তাকেই প্রাধান্য দিত বেশি। মিশরের আরেকজন রানি ছিলেন নেফেরতিতি। স্বামীর মৃত্যুর পর মিশরের হাল ধরেছিলেন তিনি। তবে মিশর শাসন করা প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রানি ছিলেন দ্বাদশ রাজবংশের শাসক সবেকনেফেরু। অবশ্য ইতিহাসের পাতা উলটালে তার আগেও কমপক্ষে ছয়জন রানির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাস্তবতা হলো, বিভিন্ন সময় মোটামুটি কয়েক ডজন নারী দ্বারা শাসিত হয়েছে আফ্রিকা। তাদের অনেকের আবার একাধিক ক্রীতদাসও ছিল।

১৯১৩ সালে প্রকাশিত ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়া জানাচ্ছে-একজন স্প্যানিশ নারী জুলিয়ানা মোরেল মাত্র চার বছর বয়সে গ্রিক, ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষা শিখতে শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি পদার্থবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, নাগরিক আইন ও ধর্মশাস্ত্রে বিস্তারিত তালিম নেন। ১৬০৮ সালে জুলিয়ানা যখন আইনে তার প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রিটা অর্জন করেন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর।

সে সময় যদি নারী নিপীড়নকারী পুরুষতান্ত্রিকতা থাকত, জুলিয়ানার পক্ষে কখনোই প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হতো না। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিপীড়িত ছিলেন না; আর দশজন সফল ব্যক্তির মতোই তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। সেই প্রচেষ্টা মোটেই বৃথা যায়নি; বরং সম্মান ও সাফল্যের পসরা নিয়ে ফিরে এসেছিল তার জীবনে। ১৬৩৯ সালে আমেরিকায় L'Ecole des Ursulines de Quebec নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল; বর্তমান যা মেইনে অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি একসময় একচেটিয়াভাবে মেয়েদের শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল। স্বভাবতই সেখানে ছেলেদের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। তারপরও পুরুষতন্ত্র কীভাবে নারীবাদীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রেখেছে, সেই অভিযোগ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। এ মহিলা কলেজগুলো এখনও পর্যন্ত চালু রয়েছে। কোনো পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এদের বাধা প্রদান করলে প্রায় ৪০০ বছর ধরে এগুলো সফলতার সাথে চলমান থাকার কথা নয়।

১৬৩৯ সালের ৪ অক্টোবর মার্গারেট ব্রেন্ট প্রথম নারী হিসেবে আমেরিকায় নথিভুক্ত ভূমির মালিকানা পান। প্রাথমিকভাবে সেটার পরিমাণ ছিল ৭০ একর। যদিও পরবর্তী সময়ে তিনি ও তার বোনদের প্রত্যেকে ৮০০ একর করে ভূমির মালিক হন। মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের গভর্নর লর্ড কালভার্ট ব্রেন্টকে এত বেশি বিশ্বাস ও সম্মান করতেন যে, নিজের ভূ-সম্পত্তির নারী নির্বাহক হিসেবে নিয়োগ দেন তাকে। নারীবাদের প্রথম ধাপের (First Wave) পূর্বেই সমাজে নারী নেতৃত্ব থাকার এই সব দৃষ্টান্ত ফেমিনিস্ট কথিত নারী নিপীড়নের ঐতিহাসিক মিথ্যাচারের গালে মোক্ষম চপেটাঘাত। তবুও নারীবাদীদের অহরহ বলতে শোনা যায়-যুগে যুগে নারীদের সফলতা অর্জনকে অসম্ভব করে তুলেছিল পুরুষদের উৎপীড়ন।

শাসনকাঠামো এবং অর্থনীতির মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও নারীদের অংশগ্রহণের ইতিহাস বেশ পুরোনো। ১৮৩৩ সালের প্রথম দিকে ওবার্লিন কলেজে মেয়েদের ভর্তির অনুমতি ছিল। মার্কিন নিউজ অনুসারে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করা প্রথম নারী ছিলেন ক্যাথরিন ব্রিওয়ার। ১৮৪০ সালের ১৬ জুলাই জর্জিয়ার ম্যাকাওয়েের ওয়েসলিয়ান কলেজ থেকে তিনি স্নাতক সম্পন্ন করেন। ১৮৬২ সালে প্রথম আফ্রো-আমেরিকান নারী হিসেবে ওবার্লিন কলেজ থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন মেরি জেন প্যাটারসন। আরও এক ধাপ এগিয়ে ছিলেন হেলেন ম্যাগিল। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্রীই প্রথম আমেরিকান নারী, ১৮৭৭ সালে প্রথমবারের মতো

যিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯০০ সালেরও আগে থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের মতো নারীরাও কলেজে স্নাতক সম্পন্ন করার সুযোগ পেতেন।

এই আলোচনায় নারীদের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশের কথা তুলে ধরা হলো, যারা অ্যাকাডেমিক, সামাজিক ও সরকারি ক্ষেত্রে তাদের সামসময়িক পুরুষদের মতো বা তাদের চেয়েও বেশি সফলতা অর্জন করেছিলেন। ইতিহাস সম্পর্কে কেউ অবগত হোক, ফেমিনিস্টরা তা একদমই চায় না।

ইতিহাসজুড়ে বরং দেখা যায়, বেশির ভাগ ফেমিনিস্ট ছিল গোঁড়া এবং পুরুষবিদ্বেষী। শুরুর দিকের এই নারীবাদীরা তাদের বর্ণবাদ এর গোঁড়ামিগুলো গোপন করার কোনো চেষ্টাই করেনি। তাই আধুনিক নারীবাদ যখন দাবি করে-ঐতিহাসিক এ ব্যক্তিত্বরা সমতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল, সেটা কেবল অনৈতিহাসিকই নয়; ভয়ংকর প্রোপাগান্ডাও বটে। তারা মূলত নারী কেন্দ্রিকতাকেই সমর্থন করেছিল। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণহত্যারও পক্ষে ছিল তারা!

ইংরেজ নারী ম্যারি ওলস্টোনক্রাফটকে দিয়েই শুরু করা যাক। তিনি ব্রিটিশ ফেমিনিজমের অগ্রদূত হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। ১৭৯২ সালে তার নারীবাদবিষয়ক প্রথম বই "অ্যা ভিন্ডিকেশন অব দ্যা রাইটস অব উইমেন" প্রকাশিত হয়। ধারণা করা হয়-নারীবাদের ফার্স্ট ওয়েভের সূচনা হয় এই বইয়ের মাধ্যমেই। এটি ফেমিনিজমের ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী গুরুত্বপূর্ণ একটি বই।

ওলস্টোনক্রাফটের বইয়ের আকর্ষণীয় দিক হলো খোদ নারীদের নিয়ে সমালোচনা। তিনি বলেছেন-নারীরা ভালো দিকগুলো অর্জনে ব্যর্থ হয়ে সভ্যতার সমস্ত মূর্খতা ও দোষ আয়ত্ত করেছে। নারীদের ব্যাপারে কঠোরতর সমালোচনা অব্যাহত রেখে তিনি আরও বলেন-এদের আবেগ ভীষণ সংবেদনশীল, বেশিরভাগ নারীই নিয়ন্ত্রিত হয় নিজেদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি দ্বারা। এটা কেবল তাদের জন্যই অস্বস্তিকর নয়; বরং অন্যদের জন্য ও ঝামেলাপূর্ণ ।তারা ক্ষেত্রবিশেষ এতটাই আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ে যে, ন্যূনতম হিতাহিত জ্ঞানটুকু থাকেনা। ওলস্টোনক্রাফটের মতে, যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়াই শুধু পরস্পরবিরোধী আবেগ-অনুভূতির আতিশয্যে নারীরা প্রায়ই দৃঢ় বিশ্বাস ও সাধনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে। তার শেষ কথা হচ্ছে-নারীরা তাদের আবেগকে উদ্দীপ্ত করার জন্য স্বীয় মননে আবেগ-অনুভূতির চাষাবাদ করে, যা তাদের দৃঢ় করে গড়ে তোলার পরিবর্তে বরং উন্মত্ততা ও মূর্খতার দিকে ধাবিত করে। এটা কোনো নারীবিদ্বেষী পুরুষাধিকার কর্মীর কথা নয়; বরং ফেমিনিস্ট আন্দোলনের একজন অগ্রদূতের বাণী। ভাবা যায়! আশ্চর্য হলেও সত্যি, ওলস্টোনক্রাফট ১৭৯২ সালে নারীদের যে সমালোচনা করেছিলেন, আজকে ২০০ বছর পরও নারীদের প্রতি অনুরূপ সমালোচনা অব্যাহত রয়েছে।

৩৮ বছর বয়সে ওলস্টোনক্রাফটের মৃত্যুর পর স্বামী উইলিয়াম গডউইন তার জীবনী লেখেন। এতে তিনি ওলস্টোনক্রাফটের পরকীয়া, জারজ বাচ্চার জন্ম এবং তার মানসিক অস্থিতিশীলতার কথা ফাঁস করে দেন। বই থেকে আরও জানা যায়-এসব কারণে নাকি একাধিকবার আত্মহত্যাও করতে চেয়েছিল এই মহিলা। সুতরাং এটা অনুমান করা মোটেই অন্যায় নয় যে, নারীদের নিয়ে ওলস্টোনক্রাফটের সমস্ত কট্টর সমালোচনার মূলভিত্তি ছিল তার নিজের বিচ্ছিরি ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা।

এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টন আমেরিকান ফেমিনিস্ট আন্দোলনের প্রথম দিককার একজন নেতা। প্রথম জীবনে আরেকজন বিখ্যাত নারীবাদী সুসান বি অ্যান্থনির ঘনিষ্ঠ সহকারী ছিলেন তিনি। মার্কিন মুদ্রায় একসময় এই সুসানের চিত্র ছিল। ১৮৬৮ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে নারী ভোটাধিকার সম্মেলনে স্ট্যান্টন একটি বক্তৃতা দেন। বক্তব্যের একদম শুরুতেই তিনি বলেন- 'পুরুষ হলো একটি ধ্বংসাত্মক শক্তি। কঠোর, স্বার্থপর এবং উদ্ধত্য। সে যুদ্ধ, সহিংসতা, দখল আর ভোগ করতে ভালোবাসে। বাস্তবতা ও নৈতিকতার দুনিয়ায় সে অনৈক্য, হাঙ্গামা, ব্যাধি এবং মৃত্যু বয়ে আনতে চায়।'

যদি সে সময় নারী নিপীড়নকারী পুরুষতন্ত্র থাকত, তবে সে ওয়াশিংটন ডিসিতে দাঁড়িয়ে এসব বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে পারত না; এমনকি নারী ভোটাধিকার সম্মেলনের অস্তিত্বই থাকত না। বক্তৃতার শেষে অবশ্য তিনি পরিষ্কার করেন-তার মন্তব্য কিছু পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সব পুরুষের ক্ষেত্রে নয়। যাহোক, তিন দশক পর তিনি পুরুষদের সম্পর্কে তার প্রকৃত অনুভূতি স্বীকার করেন। ১৮৯০ সালের ২৭ ডিসেম্বর তিনি তার দিনলিপিতে লেখেন- 'লিঙ্গ হিসেবে আমরা পুরুষদের চেয়ে বহুগুণে উন্নত।' নিঃসন্দেহে তিনি সমতায় বিশ্বাস করতেন না বরং তার মতবাদ ছিল আধিপত্যবাদ এবং নারীকেন্দ্রিকতা। আফ্রো-আমেরিকান কালো মানুষদের ভোটাধিকার প্রসঙ্গ এলেও একসঙ্গে বিরোধিতা করেছিলেন তারা। নারীবাদীদের মধ্যে এ ধরনের বর্ণবাদ খুবই সাধারণ বিষয়। নারীবাদীদের অন্তর্গত বর্ণবাদের অসংখ্য উদাহরণ বইয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। বিখ্যাত সুপ্রজননবিদ চার্লস বি ড্যাভেনপোর্টি ১৯১০ সালে ইউজেনিক্স রেকর্ড অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ সালের মধ্যেই আমেরিকান সুপ্রজননবিদ্যা আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অগ্রদূতে পরিণত হয় ড্যাভেনপোর্ট। ড্যাভেনপোর্টের সংস্থাটির কাজ ছিল সারা দেশের পরিবারগুলোর বংশগত তালিকা সংগ্রহ করা। বল্য একান্তই বাহুল্য যে, এই তালিকার প্রয়োজন হয়েছিল সমাজের অগ্রগামী পরিবার থেকে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য পরিবারগুলোর বংশপরম্পরাকে আলাদা রাখার অসৎ ও বর্ণবাদী উদ্দেশ্যে।

১৯১২ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক ইউজেনিক্স সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আমেরিকান ব্রিডার্স এসোসিয়েশন তাদের সুপ্রজননবাদ সমিতির প্রারম্ভিক প্রতিবেদন

পেশ করেন। প্রিন্সটন, জন হপকিনস, হার্ভার্ড, কর্নেল, ইয়েল। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতো সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকেও বিশিষ্ট চিকিৎসক, বিচারক, আইনজীবী ও শিক্ষাবিদরা উপস্থিত হয়েছিল এই সভায়। আমেরিকান ব্রিডার্স এসোসিয়েশন তাদের প্রতিবেদনে বলেছিল-ত্রুটিযুক্ত মানবশ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই তাদের উদ্দেশ্য। তারা এই শ্রেণির মানবসন্তানকে নৈতিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং সমাজের বোঝা হিসেবে চিহ্নিত করে। তাদের চিহ্নিত 'যোগ্য' মানবসম্পদের কাতারে অবলীলায় বাদ পড়ে দুর্বল, নিঃস্ব, অপরাধী, মৃগীরোগী, মানসিক বিকারগ্রস্ত, ক্ষীণকায়, রোগাক্রান্ত, বিকৃত, ইন্দ্রিয় ত্রুটিযুক্ত অসংখ্য মানুষ। কোনো রকম রাখঢাক না রেখে রীতিমতো তালিকা ধরে এসব মানুষকে সমাজের জন্য ভয়াবহ সংকট বলে সাব্যস্ত করা হয়। 'গুরুতর' এই সমস্যা সমাধানে তাদের টোটকা ছিল সামাজিকভাবে অযোগ্য বলে বিবেচিতদের নির্মূল করে ফেলা। 'যোগ্য ও টেকসই সমাজ' নির্মাণে তাদের প্রস্তাবিত সমাধানের মধ্যে ছিল-

*অযোগ্যদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নকরণ।

*খোজাকরণ বা বন্ধ্যত্ব গ্রহণে জোর প্রয়োগ (Sterilization)
*বিয়ে-শাদি নিয়ন্ত্রণ এবং বহুবিবাহ প্রতিরোধ।

*যন্ত্রণাহীন উপায়ে হত্যা।

*নন ম্যালথুনিসিয়ান মতবাদ তথা গর্ভধারণে কৃত্রিম হস্তক্ষেপ।

যন্ত্রণাহীনভাবে মৃত্যুর সোজাসাপ্টা অর্থ হচ্ছে (Euthanasia) মানবহত্যা। ভেবে দেখুন। মৃগী, অ্যালার্জি, হাঁপানি, অন্ধত্ব কিংবা অন্য কোনো জটিল রোগে আক্রান্ত অগণিত আদম সন্তানদের অপরাধীদের মতো অকাতরে মেরে ফেলতে চেয়েছিল এই তথাকথিত সমাজসেবকের দল। সে সময় রাজ্যে রাজ্যে 'জিম ক্রো' নামে জাতিগত বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী আইন কার্যকর হয়েছিল। বিবাহকে গুরু অপরাধ হিসেবেও বিবেচনা করা হতো অনেক রাজ্যে। এ আইন অনুসারে কেউ যদি এই পৃথকীকরণের বিরোধিতা অথবা ভিন্ন জাতির বিয়ে আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই সংগত। সুপ্রজননবাদীদের এই প্রস্তাব গণহত্যার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলো না। বিখ্যাত নারীবাদী মার্গারেট স্যাঙ্গার সুপ্রজননবিদ্যার খুব স্পষ্টবাদী সমর্থক ছিলেন। সারা দুনিয়াব্যাপী তিনি পরিবার পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠাতা ও ফেমিনিজমের আইকন হিসেবেও পরিচিত। মিসেস স্যাঙ্গারের অনেক লেখা মার্গারেট স্যাঙ্গার প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। সে সময় তার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ বিতর্কে সৃষ্টি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আফ্রো-আমেরিকানদের নির্মূল করার জন্য বন্ধ্যত্ব ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

ব্যবস্থা প্রয়োগের অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে। সচেতন মহল থেকে দাবি ওঠে, মার্গারেট স্যাঙ্গার সচেতন বর্ণবাদী এবং গণহত্যার ইন্ধনদাতা। স্যাঙ্গারের ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীরা অবশ্য চিরাচরিত প্রতারণার পথ ডিফ্লেকশনের মাধ্যমে তার কুৎসিত আদর্শকে সব সময় অস্বীকার করেছে। কিন্তু প্রবাদপ্রতিম এই নারীবাদীর বক্তব্যগুলোতে একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা সম্ভব, কতটা বিকৃত আর নির্মমতায় ঠাসা ছিল তার চিন্তাজগৎ। তিনি যেসব বিষয়কে সমর্থন করেছিলেন, তার প্রায় সবগুলোই এখনও তুমুল বিতর্কিত।

স্যাঙ্গার ১৯১৭ সালে জন্মনিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গর্ভপাত ও জন্মনিয়ন্ত্রণকে প্রকাশ্য সমর্থন জানান, নিজের ম্যাগাজিনকে ব্যবহার কলে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদ ও গণহত্যাকারী সুপ্রজননবাদের পক্ষে শক্তিশালী অর হিসেবে। স্যাঙ্গার দরিদ্রদের ঘৃণা করতেন। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি মেট্রোপলিটন ম্যাগাজিনে 'বার্থ কন্ট্রোল-মার্গারেট স্যাঙ্গারস রিপ্লাই টু থিওডোর রুজভেল্ট' শিরোনামে এক কলাম লেখেন। এতে তিনি দরিদ্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন-'বস্তিবাসীর সন্তান জন্মদানের চেয়ে বড়ো জাতীয় অপব্যয় আর কিছুই হতে পারে না। ১৯২৫ সালের ২৫ মার্চে একটি বিশেষ নৈশভোজে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ম্যাঙ্গার বলেছিলেন-'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তার অভিবাসন আইনের বদৌলতে পৃথিবীর অগ্রদূতে পরিণত হয়েছে। বেশির ভাগ ব্রিটিশ শাসনকর্তারা যেভাবে চেয়েছিল, আজ মার্কিন সরকার ঠিক সেভাবেই অভিবাসন আইন প্রয়োগ করছে। সরকার যেভাবে আইন প্রয়োগ করে মানসিক ভারসাম্যহীন, শারীরিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ, নিঃস্ব এবং অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিদের এই দেশে প্রবেশ থেকে বিরত রেখেছেন, আমরা তা সমর্থন করি। শুধু এতটুকু আশা করি যে, তারা এই আইনগুলোর পরিধি আরেকটু বৃদ্ধি করে দেশের ভেতরকার অযোগ্য ব্যক্তিদের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রতিরোধ করবে।'

১৯৩৮ সালের ৩ মার্চ স্যাঙ্গার সর্বসম্মুক্ষে তার 'হিউম্যান কনসার্ভেশন অ্যান্ড দ্যা বার্থ কন্ট্রোল' বক্তৃতায় জাতিগত-বিশুদ্ধতার লক্ষ্যে নাৎসিদের দ্বারা নারীদের জোরপূর্বক বন্ধ্যাকরণ এবং হিটলারের আদর্শ অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জারি করা আইনের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন।

তারিখবিহীন একটি অপ্রকাশিত খসড়াতে স্যাঙ্গার লিখেছিলেন-'একজন কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন, আমাদের ১০০ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে কেবল ১৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা বুদ্ধিমান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গড়ে বাকি ৮৫ মিলিয়ন মানুষের মানসিক দক্ষতা কম এবং সেটা একজন ১৫ বছরের কিশোরের সাথে তুলনীয়। এদের মধ্যে রয়েছে মূর্খ, দুর্বল, চূড়ান্ত নির্বোধ ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলো দরিদ্র , পতিতা, অপরাধী, ভবঘুরে, মাতাল ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকে জন্ম থেকেই ত্রুটিযুক্ত।'

একই খসড়ায় তিনি আরও বিবৃত করেন-'এই শ্রেণিগুলোর মাঝে জীবনীশক্তি, নৈতিকতা, কর্মস্পৃহা অনুপস্থিত।আমার মতে, নিগ্রো চিকিৎসকের কাজ সম্পূর্ণরূপে নিগ্রো পেশাজীবী ও নার্স, হাসপাতাল, সমাজকর্মীদের সাথেই হওয়া উচিত। যেমন শ্বেতাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের সাথে করে থাকে। আর এক্ষেত্রে সাফল্য নির্ভর করবে তার ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের প্রশিক্ষণের ওপর। এই নিগ্রো প্রকল্পের উদ্দেশ্য কী ছিল? চিঠির পরবর্তী সময়ে তিনি সেটা খোলাসা করেছেন। বলেছেন-'আমরা নিগ্রো জনগোষ্ঠী নির্মূল করতে চাই। তবে এই বিষয়টা ফাঁস হয়ে যাক, তা আমি চাই না।'

স্যাঙ্গারের লক্ষ্য ছিল বন্ধ্যাকরণ ও গর্ভপাতব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে আফ্রো আমেরিকানদের জন্মনিয়ন্ত্রণ। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো-কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা পরিবার পরিকল্পনার নামে প্রকাশ্যে এবং সানন্দে এই গর্ভপাতের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। ১৯১০ সালে আমেরিকার জনসংখ্যার প্রায় ১৫% মানুষ ছিল কৃষ্ণাঙ্গ। মাত্র ১০০ বছরে ব্যবধানে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১৩%-এরও নিচে। দুঃখজনক হলেও সত্য, পরিকল্পিত বর্ণবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষার বলি হয়েছিল কেবল আফ্রো- আমেরিকান সম্প্রদায়।

নারীবাদীদের স্লোগান

স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতির পাশ্চাত্য ধারণার সাথে নারীবাদী আন্দোলনের সম্পর্কটা সুস্পষ্ট। ফেমিনিস্টদের দাবির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়। তাদের প্রতিটি দাবির পেছনেই এই বিশ্বাসগুলো কাজ করে। নারীবাদ সৃষ্টির পেছনে ইউরোপের বর্বরতার ইতিহাস থাকলেও পাশ্চাত্য বিশ্বাসই এটাকে স্বতন্ত্র মতবাদ কিংবা ইজমে রূপান্তরিত করেছে। ইউরোপের খ্রিষ্টানসমাজে নারী নির্যাতনের ইতিহাস অনেক পুরোনো। খ্রিষ্টানসমাজের নারীরা এই নিপীড়নমূলক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিজেদের বিকৃত ধর্মে এর সমাধান খোঁজে। সেখানে কোনো সমাধানের অস্তিত্ব তারা পায়নি। নিজদের মূল্যায়ন ও উল্লেখযোগ্য কোনো অধিকারেরও সন্ধান পায়নি তারা খ্রিষ্টধর্মে। তখন তারা মুক্তির জন্য পাশ্চাত্যের ঘোষিত মূলনীতি বেছে নেয়। গ্রহণ করে পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা, সমতা আর উন্নতির বস্তাপচা ধারণা। পুরো নারীবাদকে আমরা ৩টি দাবি কিংবা স্লোগানের ভেতর দিয়ে দেখতে পারি।

এক.

নারী তোমার উপর থাকতে পারবে না কারো কর্তৃত্ব, তুমি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তোমার কারো প্রয়োজন নেই। স্বামী, সন্তান, পরিবার সবই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বিষয়।

নারীবাদীদের এমন স্লোগানের মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য স্বাধীনতার দর্শন। কি ধর্ম, কি পরিবার আর কি সমাজ, কারো বেঁধে দেওয়া ভালো-মন্দে নারী বিশ্বাসী হতে পারে না। সে যা ভালো মনে করবে, তা-ই করবে। নারী যখন এই পাশ্চাত্য স্বাধীনতাকে গ্রহণ করতে চাইবে তখন ঘরে অবস্থান, পরিবার পরিচালনা, পুরুষের অভিভাবকত্ব গ্রহণের মতো আল্লাহপ্রদত্ত বিষয়গুলো পরাধীনতা কিংবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বোঝাই মনে হবে। পর্দার বিধানকে সে শেকল আর বস্তাবন্দি বলে আখ্যায়িত করবে। আর এভাবেই সে আল্লাহপ্রদত্ত কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে পাশ্চাত্যের দাসত্বে প্রবেশ করে আর নিজেকে স্বাধীন ভাবতে শুরু করে। নারীবাদীরা তাদের নিজস্ব প্রকৃতি ছেড়ে পুরুষের প্রকৃতি গ্রহণ করতে চায়। নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্জন করে পুরুষের অনুকরণ করতে চায়। এখানে কোনো স্বকীয়তা নেই, নেই কোনো অনন্যতা। একজন নারীবাদী নারী তার স্বামীকে খদ্দেরের চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারে না, যেখানে কারেন্সি বা বিনিময়ই মুখ্য। প্রেম, ভালোবাসা, মমতা ও দায়িত্ববোধের সেখানে কোনো বালাই নেই।

তাদের সকল সমস্যা নারীর আল্লাহপ্রদত্ত মাতৃত্ববোধের সাথে। পরিবারকে খুশি রাখা, সংসারের প্রতি মনোযোগী হওয়া, সন্তান প্রতিপালন করার ব্যাপারে সিরিয়াস থাকাই তাদের কাছে পরাধীনতা; অথচ এগুলো নারীর সহজাত ভূমিকা। তাদের কাছে একজন নারীর স্বাধীনতা হলো নগদ বিনিময় প্রাপ্তি, এমনকি যদি তা হয় দেহসর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেও। নারীবাদ হলো চরম ভোগবাদী চিন্তাভাবনা। মেকআপ, ড্রেসিং, ইনকাম, দেহ আর বিচরণ স্বাধীনতার মাঝেই আটকে আছে তাদের পরিচয়। তারা মনে করে এগুলো করতে পারাই একজন নারীর সফলতা!

দুই.

নারী! একজন পুরুষ কখনোই তোমার আস্থার জায়গা হতে পারে না। এজন্য তুমি তার উপর নির্ভর না করে বরং তার প্রতিদ্বন্দ্বী হও। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও। তাল মিলিয়ে চলো। এগিয়ে যাও তাকে পেছনে ফেলে।

এই স্লোগানটি দেখবেন পাশ্চাত্য সমতার সাথে সম্পৃক্ত। ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার যখন সবার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা রয়েছে, তখন একজন নারী কেন তার স্বাধীনতা (নিজের ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা) ভোগ করবে না। কেন এখানে নারী-পুরুষের ব্যবধান সৃষ্টি করা হবে? পুরুষ কেন উত্তরাধিকার সম্পত্তি নারীর চেয়ে বেশি পাবে? পুরুষ বাইরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারলে নারী কেন পারবে না?

পাশ্চাত্য সমতাকে স্ট্যান্ডার্ড মেনে নিলে এরকম নানান জায়গায় প্রশ্ন আসবে, যেখানে নারী-পুরুষের বিধান ও অধিকারের মাঝে ব্যবধান রয়েছে। কারণ ইসলাম সমতাকে মানদণ্ড মানে

না। ইসলাম সর্বদা ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে থাকে; সমতার সাথে নয়। কারণ প্রচলিত সমান অধিকারের ধারণা সব জায়গায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ক্ষেত্রবিশেষ তা এক পক্ষের উপর জুলুম বয়ে আনে। যার যা প্রয়োজন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ তাকে তা প্রদান করাই হলো ন্যায়। পুরুষকে স্ত্রী, মা, বাবাসহ পরিবারের সবার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামে নারীকে কারো ব্যয় বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এই দায়িত্ব আল্লাহকর্তৃক নির্ধারিত। কাজেই নারী যা পাবে, সবটাই তার সেভিং। সেখানে কারো প্রাপ্য অংশ নেই। ফলে পুরুষের টাকার প্রয়োজন বেশি এবং উপার্জন ও খাদ্যযোগানের জন্য তাকে আবশ্যিকভাবে নিয়মিত বাইরে যেতে হয়। এজন্য তাকে বেশি ভাগ দেওয়া হয়েছে এবং তাকে বাহির সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাহির সামলানোর দায়িত্ব নারীর নয়। তার দায়িত্বের জায়গা পরিবার। ফলে তাকে ঘরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বামীর ভরণ-পোষণই তার জন্য যথেষ্ট। আর বাবার সম্পত্তি তার জন্য অতিরিক্ত। সম্পত্তির ভাগে তাকে কম দেওয়াটা অন্যায় নয়; বরং ন্যায়সঙ্গত। স্বামী যদি তার দায়িত্ব পালন না করে তা হলে স্ত্রীর অধিকার আছে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার। নারী পুরুষ কেউই সমান নয়। বরং একজন আরেকজনের জন্য পরিপূরক।

আধুনিক সময়ে এসে নারী পুরুষের এই সমতার প্রশ্ন শুধু বিধান এবং অধিকারেই সীমাবদ্ধ নেই। এখন সৃষ্টিগত এবং জিনগতভাবেই নারী-পুরুষের সমতার দাবি তোলা হচ্ছে। নারীবাদ ও তার পৃষ্ঠপোষকদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, নারী-পুরুষের পার্থক্য নিছক একটি সামাজিক নির্মাণ বা সোসাল কন্সট্রাক্ট (জেন্ডার ধারণা)। আদতে এখানে বায়োলজিক্যাল কোনো ব্যবধান নেই। সমাজে প্রচলিত বৈষম্যের ফলেই একজন মেয়ে কোমল, ঘরের কোণে থাকতে পছন্দ-করা, মাতৃত্ব ইত্যাদি গুণসম্পন্ন মানবীতে পরিণত হয়। নতুবা সেও ছেলেদের মতো বহির্মুখী ও পুরুষালি গুণাবলির অধিকারী হতো। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই মিথের পক্ষে পশ্চিমা রিসার্চ পেপারও পাওয়া যায়। বড় অদ্ভুত তাদের গবেষণা! বড় অদ্ভুত তাদের সমাজবিজ্ঞান! আদতে বর্তমান বিজ্ঞান আর গবেষণা- প্রতিষ্ঠানগুলো চলে ক্ষমতা আর মিথ্যাচারের উপর। পৃথিবীর সমস্ত কর্মকাণ্ড একসেট মিথ্যাচারের উপর ভিত্তি করে মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য পরিচালিত হচ্ছে। মিডিয়া, বিজ্ঞান, অর্থনীতি সবকিছু পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা রক্ষার জন্য পাশ্চাত্য পক্ষপাতদুষ্ট গবেষণা ও ফল প্রকাশ করে। এটা তারা করে আসছে যুগ যুগ ধরে। নতুবা ডোনেশনের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে বেশ্যাবৃত্তির মতো এই অদ্ভুত বিজ্ঞানচর্চা। এজন্যই বলি, বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করার আগে বিজ্ঞানের সত্যতা নিশ্চিত করে নেওয়া দরকার। বিজ্ঞান অকাট্য কোনো বিষয় নয় যে, তার সবকিছু চিরসত্য হবে। কিন্তু ইসলাম চিরসত্য এবং অকাট্য।

তিন.

নারী! তোমার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাই তোমার সম্মানের একমাত্র উপায়। অন্যের আয়ের উপর নির্ভরশীল হলে মানে তুমি নিজের সম্মান হারালে। এজন্য তোমাকে নিজস্ব অর্থনৈতিক আয়ে স্বাবলম্বী হতে হবে।

নারীবাদীদের এই স্লোগানটির সম্পর্ক পাশ্চাত্য আকিদার তৃতীয় বিষয় তথা উন্নতির সাথে, যেখানে উন্নয়নকে মাপা হয় কেবল জিডিপি আর জিএনপির স্কেলে। ফলে পরিবারের আঙিনায় নারীর ভূমিকার মূল্যায়ন করা হয় না পাশ্চাত্য সমাজে। নারীকে ঘর থেকে বের করে কর্মস্থলে আনতে পারাটাই যেন দেশের উন্নয়ন এবং নারী অধিকারের বাস্তবায়ন। এগুলোকে উন্নয়ন তখনই মনে হবে যখন পাশ্চাত্যের উন্নতিকে বিশ্বাস করা হবে। উন্নতির ইসলামি স্কেল দিয়ে দেখলে আপনি নারীর সামাজিক ও পরিবারিক অধিকার, তার মাতৃত্বের সংরক্ষণ, পরিবার গোছানো, সন্তান প্রতিপালন এবং শিশুর সুস্থতা ও পূর্ণাঙ্গ মানসিক বিকাশের মাঝেই উন্নতি খুঁজে পাবেন। নারীর ক্যারিয়ারের সম্পর্ক তার মাতৃত্বের সাথে; মাথাপিছু আয় বাড়ানোর সাথে নয়। মাতৃত্ব-ই নারীর ক্যারিয়ার। এই পুঁজিবাদী বিশ্বে নারীর পারিবারিক ভূমিকার কোনো বাজারমূল্য নেই। নেই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এর হিসাব। কিন্তু ইসলামে এর কোনো বিকল্প নেই। পুঁজি দিয়ে সমাজ ও পরিবারের প্রতি নারীর এই অবদান ক্রয় করা সম্ভব নয়। বাজারমূল্যের চেয়েও অনেক উর্ধ্বের বিষয় এই ভূমিকা, যাকে পরিমাপ করার মতো ভারী কোনো মানদণ্ড নেই পাশ্চাত্য সমাজে। অথচ আলকুরআন ছোট্ট একটি বাক্যে কত সুন্দর মূল্যায়ন করেছে। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা একে অন্যের পরিপূরক। একজনের কমতিকে আরেকজন পূরণ করো, এভাবে তৈরি হয় পরিপূর্ণতা।*

আপনি যদি পাশ্চাত্যের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ নারী খোঁজেন তা হলে খাদিজা, আয়েশা, ফাতেমার মতো উম্মাহর আদর্শ মেয়ে, স্ত্রী ও মায়েদের শ্রেষ্ঠ হিসাবে আবিষ্কার করতে পারবেন না। তাদেরকে আপনার কাছে সেকেলে, বস্তাবন্দি, অসহায়, ব্যর্থ মনে হবে। অথচ এই পৃথিবীতে তারাই সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন নারী। একজন নারী যতই মমতাময়ী ও সাংসারিক হোক, আদর্শে-চরিত্রে-গুণে যতই উন্নত হোক, পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে সে ব্যর্থ নারী; যদি না সে টাকা কামাই করছে। কাজে-কর্মে আত্মবিশ্বাসী একজন সফল গৃহিণীও এই মানদণ্ডে ব্যর্থ ও অসফল। এখানে ক্যারিয়ারই সবকিছু। এজন্য দেহ বিক্রি করে, হাজারো পুরুষের সাথে ঢলাঢলি করে যেসব নারী কথিত ক্যারিয়ার গড়ছে, নারীবাদীদের দৃষ্টিতে তারাই সফল। তারাই ফেমিনিস্টদের আইডল। তাদের মতে অর্থই নির্ধারণ করবে নারীর মূল্যমান।

ফেমিনিজমের মোকাবিলায় পাশ্চাত্যের এই বিশ্বাসগুলোতে আঘাত করার পাশাপাশি আমাদের ইসলামপ্রদত্ত নারী অধিকার সমাজে বাস্তবায়ন করার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এই জায়গাটায়

আমাদের চরম পর্যায়ের অবহেলা রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পার্শ্ববর্তী শিরকি সমাজের প্রভাবে এবং ইসলাম পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে নারীদের সাথে এমন কিছু বিষয় জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা ইসলামে অনুমোদিত নয়। অথচ সাধারণ মুসলিমরা এগুলো ইসলামি নির্দেশনা বলে বিশ্বাস করে আসছে। যেমন মহর আদায়ে গড়িমসি করা, সম্পদের মিরাস এবং পারিবারিক অধিকার যথাযথরূপে আদায় না করা। আমরা যখন পশ্চিমা নারীবাদের বিরুদ্ধে কথা বলব তখন ইসলামপ্রদত্ত নারীর অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া একপ্রকার ভণ্ডামি।

বর্তমান মুসলিমসমাজে নারীরা যে দুটি প্রাপ্য থেকে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হচ্ছে, তা হলো মহর এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তি। নারীদের মিরাস চাওয়াকে নির্লজ্জতা এবং ঘৃণার চোখে দেখা হয়। ভাইয়েরা ইমোশনাল ব্লাকমেইল করে দায়সারাভাবে কিছু টাকা দিয়ে বোনদের এই অধিকার কেড়ে নেয়। তাদেরকে বঞ্চিত করে প্রাপ্য অধিকার থেকে। আর স্বামীরা মহরকে অঘোষিতভাবে রহিতই করে দিয়েছে সমাজ থেকে। মহর এখন কাগুজে সংখ্যা ছাড়া কিছুই না। অনেকে তো সারাজীবন স্ত্রীর ভরণ- পোষণকেই মহর হিসেবে গণ্য করে থাকে। অথচ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান স্বামীর উপর আলাদা ওয়াজিব। মহরের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

আমাদের সমাজে নারী নির্যাতন ও হেনস্তার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো যৌতুক। পূর্বনির্ধারিত কিংবা কাঙ্ক্ষিত অর্থ বা বস্তু না পেলে সারাজীবন বউয়ের উপর এর শোধ তোলে স্বামীর পরিবার। যৌতুকের জের ধরে বহু নারী অকালে ঝরে পড়ে। অসংখ্য নারী শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। আবার অনেকে সারাজীবন হজম করে যায় নানারকম খোটা ও কটু কথা। নারীর উপর এই যৌতুকের বোঝা ইসলাম চাপিয়ে দেয়নি। দিয়েছে হিন্দুপ্রভাবিত সমাজ। ইসলামে যৌতুকের অর্থ সম্পূর্ণ হারাম। স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় কোনো প্রকার উপঢৌকন এসে গেলে ভিন্ন কথা। কিন্তু চুক্তি করে কিংবা পূর্বাকাঙ্ক্ষা থেকে সম্পদ না পেয়ে স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালানো কিংবা তাকে কটু কথা শোনানো সম্পূর্ণ জুলুম। ইসলামে এর কোনো বৈধতা নেই।নারী-পুরুষের ব্যাপারে যৌথভাবে ইসলামে যে নির্দেশনা রয়েছে, তাকে যদি কেউ একতরফাভাবে দেখে তা হলে সে ইসলামের ভারসাম্য বুঝতে পারবে না। যেমন: কেউ শুধু নারীদের প্রতি ইসলামের নির্দেশনা দেখল; তাদেরকে স্বামীর সন্তুষ্টি হাসিলের নির্দেশ করা হয়েছে, ঘরের ভেতরই তাদের মূল অবস্থান স্থির করা হয়েছে ইত্যাদি; তখন সে ভাববে ইসলাম নারীদের অবহেলা করেছে এবং পুরুষদের বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। আবার কেউ পুরুষদের প্রতি ইসলামের নির্দেশনাগুলো দেখল; পুরুষদের চারিত্রিক সার্টিফিকেট বউদের হাতে, নারীর ভরণ-পোষণ, আবাসন, ঘরোয়া কাজসহ সবধরনের অর্থনৈতিক দায়ভার পুরুষদের কাঁধে তখন সে মনে করবে ইসলাম পুরুষদের উপর জুলুম করেছে। অথচ ব্যাপার

তা নয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ এবং সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা। তার পূর্ণতা ও সামগ্রিকতা বাদ দিয়ে খণ্ডাংশ নিয়ে পড়ে থাকলে ফ্যাসাদ হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীপুরুষ কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং একজন অপরজনের পরিপূরক। তাদের মধ্যকার সম্পর্কটা প্রতিযোগিতার নয়; ভালোবাসার। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা একে অন্যের পোশাকস্বরূপ'।

নারী নেতৃত্ব

নারীর ক্ষমতায়ন কি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে?

ক্ষমতাসীনদের সব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত, বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর নয়। নারীবাদীরা অভিযোগ করে যে নারীরা ক্ষমতায়ন এবং প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে বলে নারীদের ক্ষমতায় যাওয়া উচিত। তাদের মতে, প্রশাসনে নারীর উত্থান এবং প্রবেশাধিকার বাড়ানো হলো 'সামাজিক ন্যায়বিচার' এর অংশ। যদি নারীরা ক্ষমতায় না যায় তবে নারীর ওপর ইচ্ছামতো আইনি নিষ্পেষণ চালু রেখে পুরুষতন্ত্র আজীবন টিকে থাকবে, তাদের আধিপত্য থেকে যাবে স্বমহিমায়। নারীবাদী ফসেট সোসাইটি (Fawcett Society) বলেছে, "ক্ষমতার শীর্ষ চূড়ায় নারী অনুপস্থিত [...] যদি আপনি টেবিলে না থাকেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই মেনুতে থাকতে হবে"।

এসব দাবি করার সময় নারীবাদীরা ভুলে যায় ক্ষমতার শীর্ষে পুরুষ থাকলে যদি নারীকে মেনুতে থাকতে হয়, তাহলে গুটিকয়েক সেসব ক্ষমতাধর পুরুষ বাদে বাকি সব পুরুষকেও মেনুতেই থাকতে হয়। সব পুরুষ সমান নয়-তাদের মধ্যে বুদ্ধি, দায়িত্ব, শক্তি, সম্পদ, চেহারা এবং শ্রেণির পার্থক্য আছে। শুধু বিশেষ একটি অভিজাত শ্রেণিই নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পায়। ক্ষমতায় থাকা একটা ক্ষুদ্র অংশ সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতিনিধিত্ব করে এমন বলা যেমন হাস্যকর, ঠিক তেমনই ক্ষমতায় থাকা নারীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ সকল নারীর প্রতিনিধিত্ব করবে বলে দাবি করাটাও একইভাবে হাস্যকর। তারা জুলুমতন্ত্র বদলাতে চায় না বরং এর মধ্যেই ফিট করতে চায়। অন্যায়-অপশাসনের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান না রেখে সে অপশাসনের প্রশাসনেই তারা একটি চেয়ার দাবি করে। নারীবাদীরা যদি তাদের ন্যায়বিচারের আহ্বানে আন্তরিক হতো, তবে নারী জাতির মধ্যে এ শ্রেণি বৈষম্য নিজেরাই তৈরি করতে চাইত না। বরং সম্পূর্ণরূপে একটি বিকল্প ব্যবস্থার দাবি নিয়ে আসত। ৩৪ বিহাইন্ড ফেমিনিজম

নারীদের উপকারের জন্য যা করা উচিত তা না করে যা করা অনুচিত তাই করে নারীবাদীরা। নারীবাদীদের মৌলিক একটি দাবি হলো, পুরুষরা প্রতিনিয়ত নারীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে।

কারণ হলো, তারা পুরুষ। নারীরা অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে, কারণ তারা নারী। তাদের মতে, পুরুষই সমস্যা, বিপরীতে নারী হলো সমাধান। নারীদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে এ ধরনের সেক্সিস্ট অভিযোগ করা হলে নারীবাদীরা কি ক্ষুব্ধ হতো না? উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নারী না থাকলেই যে পুরুষরা প্রতিটি সময় নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করে তা সর্বৈবই মিথ্যা। উদাহরণস্বরূপ এই বছরের শুরুর দিকে, 'Counting Women In' সংস্থা থেকে 'Sex and Power ২০১৩: Who runs Britain?' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয় 'ক্ষমতা থেকে নারীদের বাদ দেওয়া নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর'। হাইকোর্টের বিচারকদের মধ্যে যে মাত্র ১৫.৬% নারী তা নিয়ে এ রিপোর্টটিতে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। তবুও এ 'পুরুষ শাসিত' আদালতে একই অপরাধের জন্য একজন নারীর তুলনায় একজন পুরুষের বেশি শাস্তি হয়।শি প্রতিবেদনটিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মাত্র ১৪.২% নারী। অথচ HESA পরিসংখ্যান (Higher Education Statistics Agency) অনুসারে, ২০১০/১১ সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে ছিল। ডিগ্রি অর্জনে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল বেশি। প্রথম শ্রেণির ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ৫৭%। তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির এবং উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণির ডিগ্রিধারী নারী গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৬৬% যেখানে পুরুষ গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৬১%। তাও কিনা পুরুষতন্ত্রই নারীর অবনতির জন্য দায়ী!

নারী-মাত্রই কি ন্যায়বিচার করে? যদিও এটি খুবই অযৌক্তিক ধারণা, তাও যুক্তির খাতিরে একে সাময়িক মেনে নিয়ে বিনোদন নেওয়া যাক। রুয়ান্ডা, আলজেরিয়া, ইরাক, তিউনিসিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, দক্ষিণ সুদান এবং উগান্ডা-এয়া প্রত্যেকে দরিদ্র রাষ্ট্র এবং নারীবাদীরা এসব দেশকে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংস হিসেবে দেখায়। অথচ সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের কথা বললে উল্লিখিত প্রতিটি দেশে সরকারি কাজে আমেরিকার চেয়ে বেশি নারী নিয়োজিত। রুয়ান্ডায় পার্লামেন্টে নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি। তবুও রুয়ান্ডার জনসংখ্যার ৪৫% দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। রুয়ান্ডার নারী উন্নয়ন মন্ত্রী একজন নারীবাদী কর্মী। তিনি গণহত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি সেনাবাহিনী কর্তৃক বর্বরভাবে হাজার হাজার উদ্বাস্তুকে হত্যার পুরস্কার হিসেবে তাদের নারীদেরকে ধর্ষণ করতে বলেছিলেন। সুতরাং একজন নারী ক্ষমতায় যাওয়া যেখানে ন্যূনতম মানবতা নিশ্চিত করারই সামান্যতম গ্যারান্টি দেয় না, সেখানে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা তো বহু দূরের ব্যাপার। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে একইভাবে নারী শাসক ছিল। কিন্তু তারা ক্ষমতায় থাকা উচ্চবিত্ত শ্রেণির নারীদের পদবি ভারী করা ছাড়া সাধারণ নারী-পুরুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারেননি। আদতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং পার্লামেন্টে নারীসংখ্যা বৃদ্ধি এ দুয়ের মধ্যে স্পষ্টভাবেই কোনো সম্পর্ক নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার থাকা সত্ত্বেও (৫৩%) পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যায় আমেরিকা এ দেশগুলোর পিছনে ছিল।কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো, নারীরা নারীকে নির্বাচন না করে 'ভুল লিঙ্গ' অর্থাৎ একজন পুরুষ প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করছে। এ ক্ষেত্রে নারীবাদীদের উচিত ছিল নারীদের পছন্দকে সম্মান করা। কিন্তু তারা তা না করে নারী ভোটারদেরকেই দোষারোপ করতে থাকে। এরাই পার্লামেন্টে আবার সংরক্ষিত মহিলা কোটার কথা বলে।

ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য নারীর ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। নারী ক্ষমতায়ন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে না।

প্রশাসনে নারী অবস্থান আন্দোলন জুলুমতন্ত্রকেই শক্তিশালী করে

নারীবাদীরা দাবি করে যে নারী ক্ষমতায় যাওয়ার মানেই হলো নারীর অধিকার নিশ্চিত করা, সুযোগ বৃদ্ধি করা। বাস্তবে নারীদের ইচ্ছার কোনো পাত্তাই নেই তাদের কাছে। তারা নিজেদের মতো কিছু আইন বানায়, এরপর তা প্রকাশ করে দাবি করে যে এগুলোই আসলে নারীর জন্য ভালো, আর কিছুই ভালো না। সব সেক্সিস্ট। জুলুমতন্ত্র, পুঁজিবাদের এ যুগে পুরুষরা যেসব নিপীড়ন ভোগ করে তারা চায় নারীরাও তাই ভোগ করুক। এটাই নাকি সম্মান। যদি জ্যাক পাহাড়ের নিচে পড়ে যায় তবে কি জিলকেও পরে যেতে হবে?

নারীবাদীরা দাবি করে নারীরা ক্ষমতার নতুন সংজ্ঞা দেবে। ২০১৩ তে ফোর্বস কর্তৃক বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর একশজন নারীর নামের তালিকা প্রকাশকালে ফোর্বস এর মহিলা সম্পাদক বলেন, তিনি পুরোনো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সংজ্ঞায়নে নয়; বরং ক্ষমতার নতুন চিন্তা লালনকারী নারীদের নির্বাচন করতে চেয়েছেন। তার তথাকথিত 'নতুন' তালিকাটিতে ছিল প্রায় ১জন রাষ্ট্রপ্রধান যাদের সম্মিলিত জিডিপি ১১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার, ২৪ জন সিইও যারা ৮৯৩ বিলিয়ন ডলার নিয়ন্ত্রণ করেন এবং ১৪ জন বিলিয়নিয়ার যাদের কাছে ৮২ বিলিয়ন ডলারের বেশি টাকা আছে। বিয়ন্স (১৭), অ্যাঞ্জেলিনা জোলি (৩৭), এবং সোফিয়া ভার্গারা (#৩৮) সবাই ইংল্যান্ডের রানির (#৪০) আগে ছিলেন; কিন্তু সবার সামনে ছিলেন মিশেল ওবামা (৪৪)। কেননা তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পুরুষ বারাক ওবামার স্ত্রী। আসলে নারীবাদীদের ক্ষমতার এ নতুন সংজ্ঞা কোনোদিক থেকেই পুরুষতন্ত্রের চেয়ে ভিন্ন নয়।

নারীবাদীরা প্রকৃত পরিবর্তন চায় না; বরং দীর্ঘদিন যাবৎ যার দায়ে তারা পুরুষদেরকে অভিযুক্ত করে আসছে ক্ষমতা আত্মসাৎ করে ঠিক একই নিপীড়নমূলক নিয়ম সবার ওপরে চাপিয়ে দিতে চায়।

নারীবাদীরা দাবি করেন, পুরুষশাসিত পুজিবাদী ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে নারীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে রেখেছে, তাদেরকে পুরুষদের ওপর নির্ভর হতে বাধ্য করেছে (কারণ পুরুষরা স্বাভাবিকভাবেই আর্থিক দায়িত্ব পালন করতে পছন্দ করে)। নারীবাদীরা মনে করে, পুঁজিবাদ তাদের উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে রেখে দিয়েছে পুরুষকে। বাস্তবে পুঁজিবাদ পুরুষের উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে রেখেছে চাকরিকে। পুঁজিবাদ বলতে নারীর ওপর পুরুষের নিপীড়ন বোঝায় না, বোঝায় দরিদ্রের ওপর ধনীর শোষণ। সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়ানো এবং লাখ লাখ পুরুষকে দেউলিয়া করে ছাড়া পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার বদলে নারীবাদীরা নারীকেও দেউলিয়া বানাতে চায়। তারা ঘরের বাইরে নারীকে কাজ করতে বাধ্য করছে, নারীকে শালীনতা বিসর্জন দিয়ে শোষণের পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান করছে। ফলে ক্ষমতাবান অভিজাতরা খুব ভালোভাবে নারীকে বিনা বাধায় শোষণ করতে পারবে, দাস বানাতে পারবে এবং তাদের ওপরও ট্যাক্স বসাতে পারবে। উন্নয়ন!

নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ এবং নারীবাদ দুই আদর্শই পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন করতে, Divide & Rule করতে সর্বাবস্থায় একজোট। নারীবাদী আন্দোলনকে তুঙ্গে তোলার অন্যতম কারিগর সিমোন ডি বোভোয়ার (যার বই অনুবাদ করে 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' নামে প্রকাশ করেছেন হুমায়ূন আজাদ) বলেছেন, "কোনো নারীরই সন্তান লালনপালনের জন্য ঘরে থাকা উচিত নয় [...] ইচ্ছা করলেও নারীদের এমনটি করা উচিত নয়। স্বেচ্ছায় এমন পছন্দের উদাহরণ তৈরি হলে অনেক নারীই এমনটা বেছে নেবে। এভাবে নারীকে ভুল পথে টেনে নেওয়া হয়"।

বোঝাই যাচ্ছে, নারীর সহজাত চাওয়ার কোনো মূল্য নেই নারীবাদীদের কাছে। নারীবাদ আসলে একটি বিশ্বাস, একটি ওয়ার্ল্ডভিউ। এটিই তারা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয় নারীদের ভালোত্বের মুখোশে।

নেতৃত্বে অল্পকিছু পুরুষের প্রভাব এবং আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নারীবাদীরা অভিযোগ করে অথচ এ সত্যটি কখনোই উল্লেখ করে না যে প্রায় প্রতিটি পুরুষকে গড়ে তোলেন একজন নারী। একজন শিশুর বেড়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নিঃসন্দেহে তার 'মা'। প্রত্যেক তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক পুরুষই কোনো না কোনো নারীর স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা এবং আদর্শেই প্রতিপালিত হয়েছেন। নারীবাদীরা নিজেদের অধিকারের দাবিতে সবসময় সোচ্চার, কিন্তু দায়িত্বের কথা আসলে কেন চুপ হয়ে যান তারা? একজন নারীর কাছে সন্তান লালনপালন করার চেয়ে বড় দায়িত্ব আর কী হতে পারে? পরবর্তী প্রজন্মকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেয়ে মৌলিক কাজ আর কি হতে পারে? পরম যত্ন দিয়ে চোখের সামনে তাদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ করে তোলা এবং নিজের আদর্শে উজ্জীবিত হওয়া সন্তানদের ভালো

মন্দের বিচার করতে দেখা-এর চেয়ে প্রশান্তির আর কি হতে পারে? ইসলামে একজন স্ত্রীকে ঘরের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে অথচ কজন পুরুষের কাজের জায়গায় তাদের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব থাকে? নারীবাদীরা এটিকে উপেক্ষা করে কেননা এটি স্বীকার করলে অকপটে স্বীকার করতে হবে যে নারীরাই মোটের ওপর ক্ষমতাশীল। সম্ভবত পুরুষের চেয়েও বেশি। সেইসাথে এটাকেও স্বীকার করতে হবে যে প্রকৃত ক্ষমতা মানে একনায়কতন্ত্র নয়, বরং ক্ষমতা মানে দায়িত্বশীলতা।

মায়ের দায়িত্ব থেকে নারীদেরকে পুরোপুরি বের করে আনা শুধু যে নারীদেরকেই বঞ্চিত করছে তা নয়; বরং চাইল্ডকেয়ার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারকেও সুযোগ করে দিচ্ছে বাচ্চাদেরকে সরকারের পছন্দমতো বানিয়ে নিতে। বাচ্চারা এভাবে কম বয়সেই বাইরের শিক্ষায় লালিত হয়। এমন ধরনের সিস্টেমে নারীদের ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো দরকার নেই, যে সিস্টেমে জুলুমতন্ত্র শক্তিশালী হয়।

ক্ষমতা অধিকার নয়, দায়িত্ব

নারীবাদী এবং পশ্চিমা চিন্তায় ক্ষমতার সংজ্ঞায়নেই মূলত ভুলটা হয়ে যায়। অবশ্য ভোগবাদী এসব আদর্শে এর চেয়ে বেশি কিছু আশাও করা যায় না। ক্ষমতা কোনো সুযোগ নয়, এটি একটি বোঝা। ক্ষমতা মানে দায়িত্ব, অধিকার নয়। ক্ষমতা সবসময় দুর্নীতির দিকে টানে। এবং ক্ষমতায় যারা থাকেন তাদেরকে সবসময় সংযম চর্চা করতে হয়। ক্ষমতা আরোপ করার বিষয়, চেয়ে নেওয়ার বিষয় নয়। একজন সুশাসক সকল জনতার জন্য চিন্তা করেন, তাদের সবার অধিকার রক্ষায় দিনরাত কষ্ট করেন, নির্দিষ্ট কোনো দলের বা গ্রুপের স্বার্থ নয়। একটি সুশাসনে একজন নেতা নিজের ইচ্ছামতো শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে না। তাকে নির্দিষ্ট আইন অনুসারে পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়। রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালার উৎস শারিআহ-যার মর্যাদা সবার আগে। এ নীতিমালা নারী ও পুরুষ উভয়ের অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। রাষ্ট্র 'কে' পরিচালনা করছে তার কোনো প্রভাব জনগণের ওপর পড়ে না বরং নেতাকে তাঁর প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। যে ক্ষমতা পাওয়ার আবেদন করে সে ইতিমধ্যেই ক্ষমতা পাওয়ার অযোগ্য। একজন নেতা শাসন নয়, সেবা করতে বাধ্য। আর এটিই ইসলামে ক্ষমতা বা নেতৃত্বের ধারণা।

ইসলামে রাজনীতি এবং সরকারে নারী অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে তা ইসলাম যতটুকু অধিকার দিয়েছে ততটুকুই। হাদিস ও ইসলামি আইনশাস্ত্রে একজন নারী অভিজ্ঞ হতে পারেন, মানুষকে শিক্ষা দিতে পারেন এবং বিচারকার্যে অবদান রাখতে পারেন। নারী-পুরুষ উভয়েরই

দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে ম্যান্ডেট দেওয়া বা আনুগত্য প্রদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান। যদি কোনো হারবি কাফিরকে কোনো নারী আশ্রয় দেয়, সে ক্ষেত্রে খলিফাকে নারীর বিবেচনার ওপর আস্থা রেখেই তাঁর সিদ্ধান্তকে সম্মান করতে হয়, সুরক্ষা দিতে হয়।

ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার 'অধিকার' নারী-পুরুষ কাউকেই দেওয়া হয়নি। পুরুষকে এ 'দায়িত্ব' দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই নারীকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বর্তমান বিশ্ব নেতাদের মতো কোনো অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা কিংবা ভাতা পান না। জনসেবায় নিয়োজিত না থাকলে তিনি যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতেন সে অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ হিসেবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তাঁকে দেওয়া হয়। ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের সকল জনগণের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, প্রতিটি নাগরিকের অধিকারের ব্যাপারে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়। নেতৃত্বের ব্যাপারটি অনেকটাই বাধ্যতামূলক সামরিক ড্রাফটিং এর মতো। কিন্তু সেখানে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। দেশরক্ষার দায়িত্ব শুধু পুরুষকেই দেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে।

নারীরা যদি সত্যিই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত অধিকারের বাস্তবায়ন চায় তাহলে নারীবাদীদের অসামঞ্জস্যপূর্ণ এসব জগাখিচুরি বক্তব্যে তাদের বিভ্রান্ত হলে চলবে না। এভাবে চলতে থাকে পুরোনো সাইকেল, অবস্থার কোনো পরিবর্তন আসে না। একজন নারীর উচিত আল্লাহর প্রতি তার কর্তব্য পালন করা। আল্লাহপ্রদত্ত আইন বাস্তবায়নে নিজেকে নিয়োজিত করা। যে আইন ক্ষমতায়নের চেয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। যে আদর্শের নারী- পুরুষ এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে দারিদ্র্য, শোষণ এবং নিপীড়ন থেকে রক্ষার ঐতিহাসিক খ্যাতি রয়েছে। স্রষ্টাপ্রদত্ত মূল্যবোধ মেনে নেওয়া ছাড়া মানবজাতি অন্য কিছুতেই ন্যায়বিচার পাবে না। নারী ক্ষমতায় গেলেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে না, নারী ক্ষমতায় গেলে জুলুমতন্ত্র পরিবর্তন হয় না। আর ক্ষমতায় যাওয়া কারও 'অধিকার' নয়। ক্ষমতা শুধু আল্লাহর, মানুষ কেবল তাঁর দেওয়া দায়িত্বই পালন করে।

পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কে তিনটি মিথ

একটি ক্লিপে দেখানো হয়, একটি দম্পতি লন্ডনের একটি পার্কের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। প্রথম দৃশ্যে দেখানো হয় যে তর্কের এক পর্যায়ে স্বামী অনেক রেগে যান। ফলে তিনি তাঁর স্ত্রীর ওপর আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত সব পথচারীরা সেখানে হস্তক্ষেপ করে, কঠোরভাবে লোকটিকে শাসিয়ে দেয়। তারা পুলিশকে জানানোর হুমকিও দেয়। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখানো হয়, আগের বারের মতোই এবারও তর্ক শুরু হলো। কিন্তু এবার রেগে যান স্ত্রী। তিনি স্বামীকে গালি দেওয়া শুরু করেন, মাথা চেপে ধরে

ল্যাম্পপোস্টের সাথে ধাক্কা দেন। মজার ব্যাপার হলো, এবার কোনো পথচারীকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল না। অনেকেই হাসছিল। যদিও স্বামী-স্ত্রীর পুরো ঘটনাই অভিনয় ছিল, কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা সাধারণ মানুষের মানসিকতা বুঝতে পারি।

ভিডিওটি পারিবারিক সহিংসতার ব্যাপারে সমাজের বিভ্রান্ত ও ভয়ংকর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে। সবাই স্বীকার করে নিয়েছে, নারীরা যখন সহিংসতার শিকার হয় তখন তাদেরকে আমাদের অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। কিন্তু যখন সেই একই নির্যাতনের শিকার হবে একজন পুরুষ, তখন সবার মনে হয়, 'পুরুষ! তারা কীভাবে নির্যাতনের শিকার হতে পারে!'

নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ন্যায়বিচার। স্বামী-স্ত্রীর কখনোই একে অপরের দ্বারা অবনমিত, অপদস্ত হওয়া উচিত নয়। এখানে লিঙ্গ জরুরি বিষয় না। বলার অপেক্ষা রাখে না, পারিবারিক সহিংসতার শিকার হওয়া যে কারও জন্যই কষ্টের, হতাশার। এমনকি পুরুষের ক্ষেত্রেও। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে যারাই কাজ করছেন, এ সামাজিক অসুস্থতা প্রতিরোধের চেষ্টা করছেন সবাইকে বুঝতে হবে, এটি কোনো লিঙ্গভিত্তিক সমস্যা নয়। কাজেই এ সমস্যা সমাধানের জন্যও নারীবাদের মতো কোনো লিঙ্গভিত্তিক সমাধানের প্রয়োজন নেই। এখানে বেশ জনপ্রিয় কয়েকটি মিথের উল্লেখ করা হলো। মিথ ১: কেবল নারীরাই পুরুষ কর্তৃক পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়

নারীবাদী এবং নারীর অধিকার রক্ষায় কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমাগত প্রোপাগান্ডা, একপেশে প্রচারণার কারণে আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা জন্ম দিয়েছে যে, পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয় কেবলমাত্র নারীরা। আর কেউ হবে না, হওয়া সম্ভব না।

বাস্তবতা: ২০১২ সালে বিবাহিত নারীর তুলনায় বিবাহিত পুরুষেরা দাম্পত্য জীবনে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে। (Source: British Crime Survey)

পারিবারিক সহিংসতার শিকার মানুষদের মধ্যে ৪০%ই পুরুষ। (Source: Office for National Statistics)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, একপেশে সহিংস সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে ৭০% এরও বেশি ক্ষেত্রে নারীরাই দায়ী। (Source: American Journal of Public Health) [১]

নারীরা প্রায় পুরুষের সমান জুলুমই করছে, কখনো কখনো বেশিও করছে। কিন্তু এ সত্যটি যদি আপনি সামনে নিয়ে আসেন, তাহলে বিস্ফোরণ হবে। সমাজের একটি বিরাট অংশ বিষয়টি

মেনে নিতে পারবেন না। নারীবাদীদের অনেকেও বিষয়টি কোনোভাবেই মানতে পারে না। অথচ কেউ বলছে না যে পুরুষের ওপর নির্যাতনের কারণে নারীর ওপর নির্যাতন বৈধ হয়ে যায়। দুটোই সমান বর্জনীয়।

সাধারণ দম্পতিদের কথা বাদই দিই। আমরা যদি শুধু সমকামী দম্পতিদের দিকে তাকাই তাহলেও এক অদ্ভুত বাস্তবতার সম্মুখীন হব। পুরুষ সমকামীদের তুলনায় নারী সমকামীরা বেশি পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়!

রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের (সিডিসি) অনুসন্ধান অনুসারে, ৪৪% নারী সমকামীরা তাদের জীবনসঙ্গী কর্তৃক শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি অর্থাৎ ২৯%ই নারী সহযোগী দ্বারা হয়ে থাকে। যেখানে ৩৫% সাধারণ নারী (Straight, সমকামী নন এমন), ২৯% পুরুষ নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। পুরুষ সমকামীদের মধ্যে এ হার হলো ২৬%।

নারীবাদী এবং এ মিথের সমর্থকরা সবসময়ই তাদের কথা, প্রোপাগান্ডায় বোঝানোর চেষ্টা করে, পুরুষরা মজ্জাগতভাবেই আগ্রাসী এবং নারীরা অসহায়, পুরুষরা সবসময়ই আক্রমণাত্মক এবং নারীরা সবসময়ই নির্যাতিত। এ পক্ষপাতদুষ্ট প্রোপাগান্ডার ফারণে নারীর পক্ষে যেকোনো সহানুভূতি, লাইসেন্স ও প্রতিরক্ষা বৈধ হয়ে যায় এবং পুরুষের ক্ষেত্রে থাকে জিরো টলারেন্স।

মিথ ২: নারীরা পুরুষদের ক্ষতি করতে পারে না

ভিডিওটির পুরুষটিকে এমন পরিস্থিতিতে দেখেও পথচারীরা কেন হাসছিল? কেউ কেউ দাবি করছেন যে পুরুষরা যেহেতু নারীদের চেয়ে শারীরিকভাবে বেশি শক্তিশালী, তাই একজন নারী চাইলেই একজন পুরুষকে আঘাত করতে পারে না। আর যদি কেউ করেও সে ক্ষেত্রে একজন পুরুষ ভালোভাবেই তা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম।

বাস্তবতা: নারীরা চাইলে পুরুষদের মতোই ক্ষতি করতে পারে। নারীর তুলনায় পুরুষের বেশি শারীরিক শক্তি থাকলেও নারী আততায়ীরা পুরুষদের শারীরিক ক্ষতি করতে (বিশেষ করে কোনো বস্তু ব্যবহার করে) পুরোপুরি সক্ষম। এ ছাড়াও ক্ষতিসাধনের পর তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য অনেক বেশি মনস্তাত্ত্বিক এবং আইনি শক্তি নারীদের রয়েছে।

The Mankind Initiative-এর প্রকাশিত রিপোর্টে পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'পুরুষদের লোহার বার বিছিয়ে শোয়ানো হয়, তাদের খাবারে কাচ রেখে দেওয়া হয়

এবং তাদেরকে ছুরিকাঘাত করা হয়। অনেকের মুখে ঘুষি মেরে জখম করা হয় এবং কুড়াল দিয়ে হুমকি দেওয়া হয়।' Parity নামক আরেকটি সংস্থা পুরুষ ভুক্তভোগীদের একটি নমুনা প্রকাশ করেছে। তাদের অনুসন্ধান অনুসারে, প্রায় অর্ধেক ভুক্তভোগীকে অস্ত্র দিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পুরুষ গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। এক-তৃতীয়াংশকে যৌনাঙ্গে লাথি মেরে আহত করা হয়েছে। বাকিদেরকে ছুরিকাঘাতে, পুড়িয়ে, ভারী বস্তু দিয়ে আঘাতের মাধ্যমে গুরুতর জখম করা হয়েছে। কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে নারীরা পুরুষদের নির্যাতন করতে পারে। চলে। যারা করে, তাদের সবাইকে বৈষম্য এবং পক্ষপাতিত্বের স্বীকার হতে হয়। প্রশাসন তাদেরকে পাত্তা দেয় না, আদালত একচেটিয়া রায় দেয়। পুরুষ গুরুতরভাবে জখম হওয়ার আগ পর্যন্ত পুলিশ নারী হামলাকারীর বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করে না। tyfol আরও বলেছে, 'জিরো টলারেন্স নীতি এবং গ্রেফতারের নীতিগুলো শুধু পুরুষের ক্ষেত্রেই। পুরুষ ভিক্টিম এবং তাদের সন্তানদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে তেমন কেউই এগিয়ে আসে না।... এমনকি জরুরি ভিত্তিতে একজন নারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে একজন পুরুষকে দ্বিগুণ ঘাম ঝরাতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রায়ই পুলিশ তাদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বন করে এবং ব্যাপক হয়রানি করে।' শতকরা প্রায় পাঁচ ভাগ পুরুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় পুলিশ বরং সেসব অভিযোগকারী পুরুষদের গ্রেফতার করেছে। অর্থাৎ, নারীরা যে পুরুষদের শুধু নির্যাতন করতে পারে তাই না, পুলিশের সামনে তারা সেই ভুক্তভোগী পুরুষকেই অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করতে পারে। শুধু সে পুরুষ বলে।

মিথ ৩: লিঙ্গ-সমতা নারী-পুরুষের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করবে

নারীবাদের মতো আন্দোলনগুলো যে 'লিঙ্গ-সমতা'-কে সমর্থন করে, সে সমতায় পুরুষকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নারী যত বেশি পুরুষের মতো হতে পারবে ততই যেন সফল হতে পারবে। তারা নারী-পুরুষ উভয়কে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে নিয়ে আসতে চায়।

বাস্তবতা: নারীবাদের উত্থান এবং নারীর পুরুষের 'সমান' হয়ে ওঠার প্রবণতার কারণে দেখা যাচ্ছে নারীরা ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠেছে। The Independent এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, নারী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ গত ৫ বছরের ব্যবধানে ১২% বেড়েছে। যা পুরুষের তুলনায় ৪ গুণ বেশি। ১৯৭৩ সালের পর থেকে নারী কর্তৃক সংঘটিত সহিংসতা, ডাকাতি, হত্যা ও মাদকসংক্রান্ত অপরাধ ২৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১ সালে সরকারি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, গৃহকর্মী নির্যাতনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া নারীদের সংখ্যা ছয় বছরে বেড়েছে চার গুণ। অর্থাৎ ২০০৪-২০০৫ সালে ছিল ৮০৬ জন যা ২০০৯-২০১০ বেড়ে হয় ৩৪৯৪ জন।

নারীবাদীরা যদিও পুরুষের মতো সুবিধা, অধিকার পাওয়াকে নিজেদের সফলতার মানদণ্ড হিসেবে দেখেছে, কিন্তু তারা দায়িত্বে সমান অংশীদার হতে রাজি নয়। যদি ধরেও নিই, প্রচলিত সমাজে নারীরা অপমানিত, পুরুষরা সম্মানিত, আলোকিত; তাহলে তো নারীর পুরুষের সমান সম্মান অর্জন করার জন্য পুরুষের মতোই কাজ করা উচিত। নারীরা যখন সর্বাত্মকভাবে কেবল পুরুষের সমান অধিকারই ভোগ করতে চায় এবং সকলপ্রকার দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, দেখা যায় তারা সেই একই জুলুম পুরুষের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে যার জন্য তারা পুরুষকে দোষারোপ করত। বিষয়টি পুরোই নিজের স্বার্থে ক্ষমতা প্রয়োগ।

ইসলামে অবশ্যই একজন নারীর অধিকারের কথা রয়েছে। পাশাপাশি নারীকে কিছু দায়িত্ব পালনের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তাঁর দায়িত্ব হলো তাঁর স্বামীর হক ও সম্পদ রক্ষা করা এবং সন্তানদের সঠিকভাবে লালনপালন করা, দ্বীনের ওপর বড় করে তোলা। অন্যদিকে স্বামী হবেন পরিবারের প্রধান। তিনি তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের কাজ, আচরণ ও মৌলিক চাহিদার জন্য আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। কিন্তু বর্তমান মুসলিম পরিবারগুলোতে স্বামী-স্ত্রী নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না। তারা নিজেদের অধিকারে বিন্দু পরিমাণ ছাড় দিতে রাজি না। এসব পরিবারে পারিবারিক সহিংসতার মতো ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক কিছু না।

পশ্চিমা-সমাজে নারী-পুরুষের কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শিক অবস্থান, নৈতিকতা কিংবা মূল্যবোধ নেই। তারা জানে না তারা কেন বাঁচে, কী করা উচিত। কাজেই, সেখানে নারী-পুরুষদের মধ্যে হতাশা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক। নারীরা পুরুষের 'সমান' হবার চেষ্টায় কয়েক শতাব্দী ব্যয় করে ফেলেছে, অথচ তারা একবারও জিজ্ঞেস করার সময় পায়নি, যেসকল কারণে তারা পুরুষদের সেরা মনে করছে সেগুলো আসলেই সফলতা বা শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড কিনা।

'লিঙ্গ-সমতা' কোনোভাবেই নারী-পুরুষের মধ্যকার সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না। বরং নারী-পুরুষের মধ্যকার ভালোবাসা, আশা, দায়িত্ব এবং অধিকার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা, পারস্পরিক মানসিক বোঝাপড়াই পারে সুস্থ পরিবার, সমাজ ও সভ্যতা তৈরি করতে। আমাদের আচরণের ভিত্তি হওয়া উচিত ন্যায়বিচার; নিজেদের খেয়ালখুশি নয়। শুধু ইসলামই পারে নারী-পুরুষের যোগ্যতা অনুসারে শ্রমবন্টন করে উভয়ের অধিকার নিশ্চিত করতে।

সাহিত্য ও পপ কালচারে নারীবাদ ও ইসলামবিদ্বেষের ভয়াল রূপ

মার্গারেট এটউডের লেখা জনপ্রিয় The Handmaid's Tale একটি ডিস্টোপিয়ান উপন্যাস। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে পুরুষবা নারীদেরকে বন্দি করে রাখে। কাল্টরা যেমন ধর্মীয় কথাবার্তা ব্যবহার করে তাদের অনুসারীদের ব্রেইনওয়াশ করে, পুরুষরা তেমনই নারীদের ব্রেইনওয়াশ করে। এভাবে তারা নারীদেরকে নিজেদের দাস বানিয়ে নেয়। হাজার বছর ধরে কীভাবে পুরুষরা নারীদেরকে নির্যাতন করে গিয়েছে তার একটি চিত্র এঁকেছেন তিনি এ বইয়ে।

অনলাইন স্ট্রিমিং সার্ভিস হুলু (Hulu) এ উপন্যাসের ভিত্তিতে সিরিজ নির্মাণ করেছে। এ সিরিজ অল্প সময়েই বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তারা মূল উপন্যাস থেকে কেবল থিমই নিয়েছে, বাকিটা নিজেদের মতো করে করেছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের ইচ্ছামতো মিথ যুক্ত করেছে ও ব্যাপক ইসলামোফোবিয়ার প্রচার করেছে। মুসলিম নারীদের পোশাক নিয়ে তাদের আপত্তি বহুদিনের এবং তা নিয়েই প্রোপাগান্ডা করা হয়েছে সিরিজে। সেখানে ঘরের নারী চাকর একটি আলখেল্লা ধরনের জামা পরেন যেটাতে তার দেহের আকার বোঝা যায় না। অনেক সময় তাদের মুখও কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে। দেখানো হয়, এসব পোশাক আসলে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এভাবে নারী স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে।

কিন্তু এখানেই শেষ না। বোরকা নিয়ে পশ্চিমা সমাজে যেসকল সমালোচনা প্রচলিত সেগুলোতেই শেষ না তাদের প্রোপাগান্ডা। ইসলামোফোবরা নারীবিদ্বেষের যেসকল মিথ্যাচার করে সেগুলোও এখানে শক ইফেক্ট হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। এতসব অর্থহীন গল্প দিয়েই তারা তাদের প্লট তৈরি করেছে। এভাবে গড়ে উঠেছে এ সিরিজের একেকটি গল্প। থিম, করুণ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিয়ে আরও বেশি আবেদন তৈরি করা হয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধে বেশ কিছু প্রোপাগান্ডার একটি হলো-Genital mutilation। দেখানো হয়েছে, সমকামিতার দায়ে অভিযুক্ত এক নারীকে এ প্রক্রিয়ায় শাস্তি দেওয়া হয়। আরেক দৃশ্যে এক মেয়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার অভিযোগ আনলে তাকে বলা হয়েছে, এটা নাকি তারই দোষ। ইসলামোফোবরা মুসলিমদেরকে ভিক্টিম ব্লেমিং-এর দায়ে অভিযুক্ত করে। এর একটি দুর্বল চিত্রায়ণ হলো এ দৃশ্য। ইসলামের ইতিহাসে কখনো এমন হয়েছে বলে দেখা যায় না। নারী চাকরদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র দ্য রেড সেন্টারে যে গ্রুমিং গ্যাং- এর অভিযোগ দেখানো হয়, তা আসলে ডানপন্থীদের আবিষ্কার।

অনেক সেক্যুলার নারীবাদীই দাবি করেছেন, এগুলো দিয়ে আসলে হলু ইসলাম ও ইসলামি আইনকেই বুঝিয়েছে। অথচ বইয়ের মূল লেখিকা এটউড দাবি করেছেন, তিনি আসলে নারীবিদ্বেষী কাল্ট বলতে আমেরিকার ডানপন্থীদেরকে উত্থানকে বুঝিয়েছেন।

একটু গভীর নজর দিলেই আমরা নারীবাদ ও সেক্যুলারিজমের ভণ্ডামি বুঝতে পারব। এসব তাত্ত্বিক আদর্শ যে আসলে নারীকে কোনো মুক্তিই দিতে পারবে না, বরং নিয়ে যাবে ধ্বংসের অতলে, তাও বুঝতে পারব।

রিদ্দার পথে একজন মুসলিম ফেমিনিস্টের যাত্রা

প্রথম ধাপ

শুরুটা হয় যৌক্তিক কিছু অভিযোগ, কিছু ক্ষোভ দিয়ে। এমন অনেক মুসলিম পুরুষ আছে যারা স্ত্রীর হক আদায় করে না, স্ত্রী ওপর যুলুম করে। এমন অনেক মুসলিন প্রতিষ্ঠান আছে যারা এই যুলুমের বিষয়গুলো এড়িয়ে যায়। নারীর প্রয়োজনে এরা তাকে উপযুক্ত সহায়তা দেয়ার দিকগুলো তারা উপেক্ষা করে। এমন অনেক মুসলিন দেশ আছে, যেখানে এ ধরনের যুলুমগুলোকে একধরনের সামাজিক বৈধতা দেয়া হয়। অনেক সমাজে কন্যাসন্তানকে অবহেলা করা হয়। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো যার এই যুলুমগুলো করে অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের যুলুমকে দ্বীন ইসলামের নামে বৈধতা দিতে চায়। এই সমস্যাগুলো আছে, এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে। একইসাথে এটাও বোঝা দরকার যে এই সমস্যাগুলোর সমাধান নারীবাদ না। এর সমাধান হলো ইসলামী জ্ঞানের যে কমতি আছে, শরীয়াহর ব্যাপারে যে অজ্ঞতা আমাদের মধ্যে আছে সেটা দূর করা এই জ্ঞান মানুষের মধ্যে প্রচারিত হয় হকপন্থী আলিমদের মাধ্যমে। নারী নির্যাতন যদি অসুখ হয় তাহলে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা হলো এর সহজাত, প্রাকৃতিক চিকিৎসা। অন্যদিকে নারীবাদ হলো এমন এক বিষাক্ত ওষুধ, যার ফলে রোগ হয়তো অল্প কিছুটা দূর হবে কিন্তু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় একদিকে রোগী মরার দশা হবে অন্যদিকে আরও দশটা নতুন অসুখ দেখা দেবে।নারী নির্যাতনের বিষয়টা নারীবাদ কীভাবে উপস্থাপন করে? নারীবাদ তারস্বরে চেঁচিয়ে বলে, 'সবকিছুর মূলে হলো পুরুষতন্ত্র।' নারীবাদের বক্তব্য হলো-পুরুষ জাতটাতেই সমস্যা। যেসব নারী পুরুষতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে তারাও সমস্যার অংশ। নারীবাদের মতে, পুরুষরা সহজাতভাবে নারীকে শোষণ আর নির্যাতন করতে চায়। চায় নারীর দুর্বলতার সুযোগ নিতে। এটা হলো বাস্তব সমস্যা আর ন্যায্য অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অবৈধ ভাষার ব্যবহার। আর একসময় সমস্যাকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে ভাষাই।

দ্বিতীয় ধাপ

প্রথম ধাপে ক্ষোভ এবং অভিযোগের কারণ ছিল কিছু পুরুষ (এবং নারীর) যুলুম। দ্বিতীয় ধাপে অভিযোগ ও ক্ষোভগুলো বাস্তবতা থেকে মোড় নেয় নানা বিমূর্ত, মতাদর্শিক দিকে।

- অমুক ইসলামী কনফারেন্সে কোনো নারী বক্তাকে রাখা হয়নি কেন? অনুষ্ঠানের পোস্টারে পুরুষ বক্তাদের ছবি থাকলেও নারী বক্তাদের ছবি নেই কেন?
- হিজাব নিয়ে পুরুষ ইমামরা কেন লেকচার দিচ্ছে? মুসলিম নারীরা কী পরবে সেটা নিয়ে পুরুষরা কেন কথা বলবে?

- নারী ও পুরুষের সালাতের জায়গার মাঝখানে পার্টিশান কেন? আজকের যুগেও নারীপুরুষের মেলামেশায় কেন এত কড়াকড়ি? কেন নারী আর পুরুষের স্থান পৃথক হবে?

- পুরুষ হবার কারণে বিশেষ সুবিধা পাবার কথা মুসলিম পুরুষরা কেন স্বীকার করে না?

- নারীদের কেন শালীন আর বিনম্র হতে হবে? পুরুষ কেন নারীর বিষয়ে কথা বলবে?

- পুরুষরা কেন নারীবাদ নিয়ে কথা বলবে?

নারীবাদ ঢালাওভাবে পুরুষের বিরুদ্ধে শোষক ও নিপীড়ক হবার অভিযোগ তোলে। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাওয়া অভিযুক্তের অধিকার। কিন্তু যখনই কোনো পুরুষ সেটা করতে যায় তখন সেটা হয়ে যায় 'পুরুষতান্ত্রিক বয়ান'। নারীবাদের কাছে সব প্রশ্নের মুখস্থ উত্তর একটাই- পুরুষতন্ত্র। সবকিছুর জন্য দায়ী পুরুষতন্ত্র।

প্রথম ধাপে সমস্যাগুলো সংজ্ঞায়িত হয়েছিল ইসলামের অবস্থান অনুযায়ী নারী ও পুরুষের হক এবং যুলুম ও ইনসাফের জায়গা থেকে। দ্বিতীয় ধাপে এসে আলোচনার কাঠামো গড়ে ওঠে এবং চালিত হয় পশ্চিমা নারীবাদী এবং লিবারেল অবস্থানকে কেন্দ্র করে। এর প্রমাণ হলো দ্বিতীয় ধাপের মুসলিম নারীবাদীরা এমন অনেক বিষয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় যেগুলো কুরআন-সুন্নাহ থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামী আইন ও শরীয়াহর অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমন: পর্দা, ঘরের বাইরে নারীর চলাফেরা, নাই ও পুরুষের মেলামেশা; বিশেষ করে গাইর-মাহরাম পুরুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে শরীয়াহর সীমারেখা, ইত্যাদি।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দ্বিতীয় ধাপের মুসলিম নারীবাদীরা ইসলাম সম্পর্কে খুব একটা জানে না। যেসব বিষয়ে তারা আপত্তি তোলে সেগুলোর ব্যাপারে ইসলামী আইন এবং কুরআন-সুন্নাহর দলিলের অবস্থান তাদের অজানা। এ বিষয়গুলো যখন জানানো হয় তখন তারা এগিয়ে যায় তৃতীয় ধাপের দিকে।

তৃতীয় ধাপ

এই ধাপে এসে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় ইসলামী ইলম এবং ইলমের সিলসিলাকে। দ্বিতীয় ধাপে অভিযোগ ছিল মুসলিম সমাজের বিভিন্ন আচার আর বিধিবিধান নিয়ে। তৃতীয় ধাপে এসে

আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয় মুসলিম উম্মাহ, বিশেষ করে অতীত প্রজন্ম এবং আলিমগণকে।

নারীবাদের দর্শন অনুযায়ী, নারীদের আজ যে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে তার মূল কারণ পুরুষতন্ত্র। পুরুষতন্ত্র হলো এমন এক অশুভ ব্যবস্থা, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীদের শোষণ করে আসছে। কাজেই নারীবাদের জায়গা থেকে এটা ধরে নেয়া স্বাভাবিক যে অতীত প্রজন্মগুলোর সময়েও পুরুষতন্ত্র ছিল এবং আজকের চেয়ে আরও শক্তিশালী ছিল।এমন অবস্থায় একজন নারীবাদী নিজেকে প্রশ্ন করে-
ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে যে আলিমরা এসেছেন তাঁরা সবাই কি এই পুরুষতন্ত্রের অধীনেই ছিলেন না? পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা আর নারীবিদ্বেষের লেন্সের আলোকেই কি তাঁরা তাদের ফতোয়াগুলো লেখেননি? যে নারীবিদ্বেষ আজকের আলিমদের মধে আমরা দেখি সেটা কি কয়েকশ কিংবা হাজার বছর আগের আলিমদের মধ্যে আরও বেশি মাত্রায় ছিল না? ইসলামের ইতিহাসের যেকোনো সময়ের যেকোনো আলিমের বই খুললে আমরা এমন অসংখ্যা অবস্থান পাব যেগুলো শরীয়াহর দিক থেকে, কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে সঠিক। কিন্তু নারীবাদের দৃষ্টিতে 'পুরুষতান্ত্রিক' এবং 'নারীবিদ্বেষী'। এ কারণেই তৃতীয় ধাপে এসে এমন অনেক নারীকে দেখা যায়, একসময় যারা খুব আগ্রহ নিয়ে ইলম অর্জনের চেষ্টা করত-হয়তো কোনো আলিমের অধীনে কিংবা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা নিয়ে পড়ত, কিন্তু তারা যখন আলিমগণের লেখায় এমন কিছু খুঁজে পায়, যা নারীবাদের সংজ্ঞানুযায়ী 'ভুল' বা 'ঘৃণ্য', তখন ইলম থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। পুরো মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের আলিমগণ তাদের চোখে পরিণত হয় পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূতে। মসলিম নারীবাদী তখন সিদ্ধান্ত নেয় সে কোনো আলিমের (অতীত কিংবা বর্তমান। কথা শুনবে না। সে সরাসরি কুরআন আর সুন্নাহর কাছে যাবে। কেবল কুরআন আর সুন্নাহই পুরুষতন্ত্রের কালো থাবা থেকে মুক্ত।
কিন্তু...

চতুর্থ ধাপ

কুরআন ও সুন্নাহয় তারা এমন অবস্থান দেখতে পায়, যা নারীবাদের মানদণ্ডে টিকে না।

- সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াত।
- সূরা বাক্বারার ২২৮ নং আয়াত।
- দুই জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। উত্তরাধিকারের ব্যাপারে শরীয়াহর অবস্থান।

- আকল ও দ্বীনে নারীর অসম্পূর্ণতা

- জাহান্নামীদের অধিকাংশ হবে নারীশ।

- যদি কোনো মানুষকে সিজদাহ করার অনুমতি থাকত তাহলে স্বামীকে সিজদাহ করার হাদীস!!...

মুসলিম ফেমিনিস্ট এমন আয়াত ও হাদীসের মুখোমুখি হয়, যেগুলো নারীবাদের অবস্থান থেকে কোনোভাবেই মেনে নেয়া সম্ভব না। কীভাবে সে নারীবাদের আদর্শের সাথে এই আয়াত ও হাদীসগুলোর সমন্বয় করবে? কীভাবে আল্লাহ এতগুলো আয়াত এবং হাদীস নাযিল করলেন, যেগুলো নারীবাদের সংজ্ঞানুযায়ী নারীবিদ্বেষ ছাড়া আর। কিছুই না?

মরিয়া হয়ে সে সমন্বয়ের চেষ্টা করে-

হয়তো এই সবগুলো আয়াত আর হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হয়তো চেষ্টা করলে নারীবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো-না-কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যাবে। যে ওয়াহিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্পষ্টভাবে বুঝেছে, যা এখনো পর্যন্ত প্রজ্ঞা, ভাষাগত উৎকর্ষ এবং ন্যায়ের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে-হয়তো সেটাকে গত ১০০ বছরের সেক্যুলার জেন্ডার স্টাডিস প্রফেসরদের অসংলগ্ন প্রলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে। কিন্তু এই মনোভাব খুব বেশি দিন ধরে রাখা যায় না। চতুর্থ ধাপে পৌঁছানোর পর 'মুসলিম ফেমিনিস্ট' উপলব্ধি করে যে বৃত্তকে কখনো ত্রিভুজ বানানো যায় না। নারীবাদের সাথে ইসলামকে খাপ খাওয়ানোর একমাত্র উপায় হলো কুরআনের ঐশ্বরিক উৎসকে অস্বীকার করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর প্রয়োগযোগ্যতা প্রত্যাখ্যান করা।

এই ধাপের নারীবাদীদের মধ্যে এমন অনেককে আপনি পাবেন যারা বলে- আমাদের কুরআনকে না বলা শিখতে হবে। এমনকি এমনও মানুষ পাবেন, যারা নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) ব্যাপার কুৎসিত- সব শব্দ ব্যবহার করে, কারণ তাঁরা নাকি 'পুরুষতান্ত্রিক'! ইয়াদুবিল্লাহ।
চতুর্থ ধাপে এসে নারীবাদীরা অবলীলায় এমন-সব কথা বলে, যা স্পষ্ট কুফর। একই সাথে এমন-সব বিষয়ের পক্ষে প্রচারণা শুরু করে যেগুলো ইসলামের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। যেমন: জামাতের সালাতে কোনো মহিলাকে ইমাম বানানো, মুসলিম নারীর সাথে কাফির

পুরুষের বিয়ে, সমকামিতার বৈধতা, ট্র্যান্সজেন্ডারিসমের পক্ষে অবস্থান, যিনা এবং ব্যভিচারকে জায়েজ মনে করা, ইত্যাদি। এটা কীভাবে সম্ভব?

কারণ, চতুর্থ ধাপে পা দেয়া 'মুসলিম' ফেমিনিস্ট এরই মধ্যে ইতিহাসের সব আলিমের অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। শরীয়াহর চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয় এবং আবশ্যক কোনো অবস্থান থাকতে পারে যা মুসলিমদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করবে-এটাও সে অস্বীকার করে বসেছে। যখনই কেউ বলে-আল্লাহ আমাদের এমনটা করতে নির্দেশ দিয়েছেন- তখনই পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি সাব্যস্ত করে নারীবাদীরা তাকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেয়। কারণ, তাদের কাছে কর্তৃত্বের ধারণাটাও পুরুষতন্ত্রের ফসল।

খুব বেশি দিন চতুর্থ ধাপে থাকা যায় না। পরস্পরবিরোধী দুটো অবস্থান (ইসলাম এবং নারীবাদ) একসাথে নিজের মধ্যে ধারণ করা অত্যন্ত ক্লান্তিকর একটা কাছ। এমন অবস্থায় পৌঁছে যাবার পর, এমন-সব অবস্থান গ্রহণ করার পর নিজেকে মুসলিম মনে করাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এর সাথে যুক্ত হয় 'মুসলিম' ফেমিনিস্টদের অদ্ভুত কথাবার্তা এবং কুফরি অবস্থানের কারণে অন্যান্য মুসলিমদের কাছ থেকে আসা যৌক্তিক বিরোধিতা ও সমালোচনা। সবকিছু মিলিয়ে তাদের মধ্যে তিক্ততা বাড়তে থাকে। নিজের মুসলিম পরিচয় নিয়েও তাদের মধ্যে তিক্ততা কাজ করে।

আর তারপর

পথম ধাপ

পথম ধাপে এসে 'মুসলিম' ফেমিনিস্ট প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়। পৌঁছে যায় খাদের কিনারায়।

*আল্লাহ যদি নারী ও পুরুষের ব্যাপারে সাম্যবাদী হন তাহলে নিজের ব্যাপারে কুরআনে কেন পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার করলেন?

*আল্লাহ কেন প্রথমে আদমকে (আলাইহিস সালাম); একজন পুরুষকে সৃষ্টি করলেন? কেন প্রথমে নারীকে সৃষ্টি করলেন না?

*শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন একজন পুরষ? কেন নারী নন?

*কেন আল্লাহর ওয়াহি নারীর মাধ্যমে না এসে পুরুষের মাধ্যমে এল?

জন্ম নেয় একের পর এক প্রশ্ন। এই প্রশ্নের স্রোত একসময় তাকে নিয়ে যায় কুফর ও রিন্দার অন্ধকারে। আর যে প্রশ্ন দিয়ে এ পথচলা শুরু হয়েছিল সেই প্রশ্নটাই শেষ ধাক্কা দিয়ে তাকে খাঁদে ফেলে দেয়-

*আল্লাহ কেন পুরুষতন্ত্রকে টিকে থাকতে দিলেন? আল্লাহ কেন হাজার হাজার বছর ধরে বিলিয়ন বিলিয়ন নারীকে পরাধীন এবং ধর্ষিত হতে দিলেন?

আর এই ধাপে এবং বাকি সব ধাপে নারীবাদের উত্তর একটাই-

আল্লাহ বলে কেউ নেই। ধর্ম হলো পুরুষতন্ত্রের বানানো গল্প, যার একমাত্র উদ্দেশ হলো নারীকে পুরুষের অধীন করে রাখা।

নারীবাদের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো এটা একটা চেইন রিঅ্যাকশনের মতো। একজন মানুষ যখন সবকিছুকে 'পুরুষতন্ত্র' দিয়ে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে তখন বাকি ধাপগুলোতে যাওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সব ধরনের অবিচারকে পুরুষতন্ত্রের দোষ বলে চালিয়ে দেয়ার এই ব্যাখ্যা যদিও ভুল, কিন্তু এটা একটা সর্বগ্রাসী ব্যাখ্যা। আসলে পঞ্চম ধাপে থাকা ফেমিনিস্টরা আগের ৪ ধাপের মুসলিম ফেমিনিস্টদের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সৎ। পঞ্চম ধাপের নারীবাদী তার আদর্শিক সমীকরণের চূড়ান্ত ধাপ পর্যন্ত গেছে। অন্যরা যায়নি।

নারীবাদ কি মুসলিম নারীদের ইসলামত্যাগের কারণ

নিঃসন্দেহে। এর অসংখ্য প্রমাণ আছে। নারীবাদ কীভাবে মুসলিম নারীদের ধর্মত্যাগের দিকে নিয়ে যায় সেটা বোঝা আসলে কঠিন না। নারীবাদ লিবারেল-সেক্যুলার দর্শনের অংশ। লিবারেল-সেক্যুলারিসম ধর্মকে আক্রমণ করে। নারীবাদও ধর্মকে আক্রমণ করে। ইনফ্যাক্ট, ধর্মকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে লিবারেল-সেক্যুলারিসমের প্রধান হাতিয়ারগুলোর অন্যতম হলো নারীবাদ। যেসব মুসলিমরা নারীবাদী ধ্যানধারণা রাখে তাদের যে ইসলামের ব্যাপারে অনেক, অনেক আপত্তি থাকবে, এতে অবাক হবার কিছু নেই।

কাজেই মুসলিম নারীদের ইসলামত্যাগের পেছনে নারীবাদের ভূমিকা নেই বলাটা হাস্যকর। কালোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদীদের ঘৃণার পেছনে বর্ণবাদী আদর্শের কোনো ভূমিকা নেই বলাটা কি হাস্যকর না? যে বলে শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদীদের আদর্শ আর তাদের বর্ণবাদী ঘৃণার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, সে আসলে শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদ কী, তা-ই বোঝে না।

নারীবাদকে সমর্থন করা মুসলিমদের অবস্থাও অনেকটা এ রকম। মুসলিমদের ঈমানের ওপর নারীবাদের ক্ষতিকর প্রভাব তারা অস্বীকার করতে চায় কারণ তারা নারীবাদের ইতিহাস জানে না। যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, নারীবাদ কী? তারা আপনাকে স্কুল-কলেজে শেখা কিংবা পত্রিকার পাতা থেকে মুখস্থ করা কোনো উত্তর শুনিয়ে দেবে। যখন নারীবাদের ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন করবেন, তখন জনপ্রিয় কিছু বই কিংবা গবেষণার কথা তোতাপাখির মত আওড়ে যাবে। এটা অনেকটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর ব্রিটেনের সরকারি কর্মকর্তাদের লেখাজোখা পড়ে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে জানার মতো। সে আপনাকে রেললাইন আর সতীদাহ প্রথার কথা শোনাবে কিন্তু নীলচাষ, গণহত্যা, জালি ওয়ানওয়ালাবাগের কথা এড়িয়ে যাবে। বাস্তবতা হলো ধর্মকে, বিশেষ করে ইসলামকে আক্রমণ করার জন্য লিবারেল-সেক্যুলারিসম যেসব অস্ত্র সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে নারীবাদ তার অন্যতম।

নারীবাদী আর তাদের সমর্থক পুরুষরা যেসব মুখস্থ উত্তর দেয় ওরা বলে, নারীবাদের কারণে মুসলিম নারীরা ইসলাম ত্যাগ করছে না। তারা ইসলাম ত্যাগ করছে মুসলিম পুরুষদের দুর্ব্যবহার আর অত্যাচারের কারণে। এই ধরনের কথা যারা বলে তারা সাধারণত নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে তিন ধরনের প্রমাণ আনে-

১। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিংবা শোনা কথা। (আমি শুনেছি, আমার চেনা একজন, ইত্যাদি।

২। মসজিদে নারীর কম উপস্থিতি।

৩। মুসলিম সমাজে নেতৃত্বের অবস্থানে নারীদের অনুপস্থিতি।

লক্ষ করুন, মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া অনেক নারী আজ কেন ইসলাম নিয়ে হতাশ, তার কোনো ব্যাখ্যা এসব 'প্রমাণ' থেকে পাওয়া যায় না। যেহেতু আজ আগের চেয়ে বেশি নারী ইসলাম ত্যাগ করছে তাই ওপরের যুক্তি অনুযায়ী এখন ১,২,৩ এর পরিমাদ বেশি হবার কথা। অর্থাৎ আগের চেয়ে এখন বেশি মহিলা ঘরে নির্যাতিত হচ্ছে, মসজিদে আগের চেয়ে কম নারী আসতে পারছে এবং নেতৃত্বের অবস্থানে নারীদের সংখ্যা আগের তুলনায় কমছে। কিন্তু এর কোনোটাই সত্য না। ৫,১০, ২০, ৫০ কিংবা ১০০ বছর আগের চেয়ে আজ নারী নির্যাতন বেশি হচ্ছে-এমন কোনো প্রমাণ নেই; বরং নারীবাদীদের যুক্তি অনুযায়ী নারী নির্যাতন এখন কম হবার কথা। কারণ, 'নারীবাদের আলো' পাবার সৌভাগ্য আগের প্রজন্মগুলোর হয়নি, কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম নারীবাদের মাধ্যমে অনেক কিছু শিখেছে। তাই আজকের চাইতে আমাদের বাপদাদাদের প্রজন্মে নারী নির্যাতন বেশি হবার কথা। আর আমাদের মা-দাদিদের প্রজন্মে ইসলাম ত্যাগের হারও বেশি হবার কথা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তাদের প্রজন্মে ইসলাম নিয়ে কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু আজ আছে। কাজেই অত্যাচার বেশি হচ্ছে তাই বেশি নারী ইসলাম ত্যাগ করছে, এই কথার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

একইভাবে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে মসজিদে এবং নেতৃত্বের অবস্থানে আজ নারীদের উপস্থিতি বেশি (এটা ইসলামের দিক থেকে ভালো না মন্দ, সেটা ভিন্ন আলোচনা)। নারীবাদীরাও এটা স্বীকার করে। শুধু স্বীকার করে না, নারীর 'ক্ষমতায়নের' কৃতিত্বও তারা দাবি করে। যদি মসজিদ কিংবা নেতৃত্বের অবস্থানে নারীদের অনুপস্থিতি ইসলাম ত্যাগের কারণ হয় তাহলে আজ সেই হার কি কম হবার কথা না? অথচ সেটা বাড়ছে। কেন?

আমরা বরং দেখছি একদিকে মসজিদে ও নেতৃত্বের অবস্থানে নারীদের উপস্থিতি বাড়ছে অন্যদিকে ইসলাম ত্যাগের হারও বাড়ছে। কেবল সমানুপাতিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই কিন্তু বলা যায়, নারীদের ইসলাম ত্যাগ বন্ধ করার জন্য আমাদের উচিত নারীবাদের আবির্ভাবের আগের সময়টাতে ফিরে যাওয়া।

সত্যি করে বলুন তো, আপনার চেনা কয়জন নারী কয়েক বছর আগে ধার্মিক কিংবা নিদেনপক্ষে ধর্মভীরু ছিল, কিন্তু এখন নারীবাদী বুলি আওড়ায়? শরীয়াহ, উলামা আর ইসলাম নিয়ে সমালোচনা করে?

আলহামদুলিল্লাহ, এমন অনেক বোন আছেন যারা স্রোতের বিপরীতে গিয়ে নারীবাদী চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু সার্বিকভাবে পশ্চিমা বিশ্বে থাকা মুসলিম নারীদের অবস্থান দিন দিন খারাপ হচ্ছে। যে দাবি করে নারীবাদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই সে কল্পজগতে আছে।

প্রশ্ন হলো, ইসলাম ত্যাগের কারণ তাহলে কী? শালীনতা এবং নম্রতা হারিয়ে যাবার ব্যাখ্যা কী? ঈমান হারানোর কারণ কী?

নারীবাদী তত্ত্বের প্রথম ভিত্তি হলো নারী এবং পুরুষের মধ্যে সবকিছু সম্পূর্ণ এক হতে হবে। এই মূলনীতি মেনে নিলে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের অনেক কিছুই মেনে নেয়া সম্ভব না। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ সমান না। ইসলাম নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা ভূমিকা নির্ধারণ করে।

কোন মুসলিম নারী যখন মনে করে নারীর পোশাকের ব্যাপারে বিধিবিধান আসলে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার কূটকৌশল-তখন সে অবশ্যই ওই ধর্মের প্রতি নেতিবাচক ধারণা রাখবে, যে ধর্ম শালীনতা এবং নম্রতার ওপর গুরুত্ব দেয় এবং কঠোরভাবে পর্দার বিধান মেনে চলাকে বাধ্যতামূলক করে। যখন কোনো মুসলিম নারী মেনে নেয়, নারীকে অধীনস্থ করে রাখার জন্য পুরুষরা ইতিহাসজুড়ে পুরুষতন্ত্র নামের এক বৈশ্বিক ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে, তখন সে তো ওই ধর্মকে মেনে নিতে পারবে না, যে ধর্ম শিক্ষা দেয়-

পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযতকারিণী ওই বিষয়ের, যা আল্লাহ হিফাযত করেছেন। [তরজমা, সূরা আন-নিসা, ৩৪]

আর অতীত এবং বর্তমানের আলিমদের অধিকাংশ পুরুষ। কাজেই নারীবাদের আদর্শে দীক্ষিত কেউ ইসলামকে মেনে নিতে পারবে না, এটাই স্বাভাবিক।

তবে এর দায় শুধু নারীদের না। যেসব পুরুষ (বিশেষ করে ধার্মিক পুরুষ) নারীবাদী বিভিন্ন ধ্যানধারণা প্রচার এবং সমর্থন করে, তাদের ওপরও এর দায় বর্তায়। এই ধরনের পুরুষরা ক্রমাগত বলে, 'মুসলিম পুরুষরা হলো আবর্জনা।' সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয়টা হলো এরা নারীবাদী ধ্যানধারণার একধরনের ধর্মীয় বৈধতা তৈরি চেষ্টা করে। এদের কারণেই নারীবাদের ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। যখনই কেউ নারীবাদের কারাগুলো নিয়ে আলোচনা করে,

এই পুরুষরা অর্থহীন চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। ভুল যুক্তি, ফ্যালাসি আর ব্যক্তি আক্রমণের পসরা খুলে হাজির হয়।

এই ধরনের পুরুষরা, বিশেষ করে পশ্চিমের অনেক দাঈরা, সমস্যার অংশ। এই লোকগুলোর সমর্থন না থাকলে মুসলিম নারীবাদ নামের বস্তু অনেকে আগেই মুখ থুবড়ে পড়ত।

মুসলিম নারীবাদ : উপনিবেশবাদের পদচিহ্ন

সাধারণ মুসলিমরা নারীবাদ বলতে পশ্চিমা নারীবাদকেই বোঝে। কিন্তু মুসলিম নারীবাদীদের দাবি হলো, তাদের নারীবাদ ও পশ্চিমা নারীবাদ একই নয়। ১৯ তাদের মতে, পশ্চিমা নারীবাদ তারা কখনোই গ্রহণ করবে না। তারা পশ্চিম থেকে শুধু 'নারীবাদ' শব্দটাই ধার করেছে। নিজেদের নতুন আন্দোলনের সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে এ মতাদর্শের নাম দিয়েছে 'মুসলিম নারীবাদ'। তারা অত্যন্ত জোরালো স্বরে বলে, শুধু 'নারীবাদ' শব্দটি গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে তারা পশ্চিমা নারীবাদের সকল মূল্যবোধকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা মনে করে, নারীবাদের সমালোচকদের কোনোভাবেই সব নারীবাদকে এক পাল্লায় মাপা উচিত নয়। (#NotAllFeminists...)

মুসলিম নারীবাদীদের দাবি, যদিও-বা নারীবাদের উৎপত্তি হয়েছে পশ্চিমে, কিন্তু এর মূল মূল্যবোধ পৃথিবীজুড়ে সব মূলধারার জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তারা মোটেই Femen আন্দোলনের মতো নন। অনেক প্রগতিশীল গবেষক এবং কর্মীরা নিয়মিত এর পক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন, বই-লিফলেটের মাধ্যমে আদর্শ প্রচার করছেন। মুসলিম নারীবাদীরা বিশ্বাস করে, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন মূল্যবোধগুলোই শুধু তারা গ্রহণ করেছে। কাজেই মুসলিমদের তাদের কাজের বিরোধীতা করার কোনো কারণ নেই। (১২০)

বিষয়টি আসলেই অবাক করা। মুসলিমদের মধ্য থেকেই একটি জনগোষ্ঠী পশ্চিমের আদর্শ দিব্যি গ্রহণ ও প্রচার করে যাচ্ছে। মুসলিমরা বুঝতে পারে না, ঠিক কী কারণে তারা পশ্চিমা টার্ম, তাদের ওয়ার্ল্ডভিউ, বুদ্ধিবৃত্তি, আইকন, সেক্যুলার চিন্তা গ্রহণ করছে এবং পরবর্তী সময়ে তাঁকে ইসলামের ওপর আরোপ করছে। ইসলামের নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করছে। ইসলাম কি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান নয়? তাহলে আমাদেরকে ঠিক কোন কারণে পশ্চিমা নারীবাদীদের টার্ম এবং মূল্যবোধকে গ্রহণ করতে হবে? ইসলামে কি এসবের সমাধান নেই?

মজার বিষয় হলো, যখনই মুসলিমরা এসব বিষয়ে মুসলিম নারীবাদীদেরকে প্রশ্ন করে, তারা তখন প্রচণ্ড রেগে যায়। এসবের জবাব দিতে গিয়ে তারা সবসময় ভিক্টিম কার্ড খেলে। নিজেদেরকে ভিক্টিম দেখিয়ে তারা বলেন, 'আপনি কেন মুসলিম নাধীদের অধিকারের বিরুদ্ধে কথা বলছেন? নিজেদের অধিকার হওয়া সচেতন হওয়া কি অন্যায়?' এগুলো হাস্যকর, অর্থহীন জবাব। এটি প্রশ্ন ও সমালোচনাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য একটি আবেগপ্রবণ আবেদন তৈরি করা ছাড়া আর কিছুই না। তাদের যুক্তি অনুসারে, আপনি কম্যিউনিজমের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবেন না। কম্যিউনিজমের বিরুদ্ধে কথা বলার মানে হলো দরিদ্র শ্রমিক জনসাধারণের বিরুদ্ধে কথা বলা!

নারীর অধিকারে বিশ্বাস করা আর নারীবাদী হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয়। আমি যিশুকে খ্রিষ্ট, নবী হিসাবে বিশ্বাস করি (গ্রীক ভাষায় মিসায়াহ)। আমি কি খ্রিষ্টান হয়ে গেলাম? আমি মনে করি যে দারিদ্র্য মানুষের জন্য অভিশাপ, দেশকে দ্রুত দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা জরুরি। এর মানে কি আমি একজন কম্যিউনিস্ট? আমি চাই জায়নবাদ ধ্বংস হোক। তাঁর মানে কি আমি অ্যান্টি-সেমিটিক? আসুন একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করি। নারীবাদীরা কি বিশ্বাস করে যে পুরুষদেরও সমান অধিকার থাকা উচিত? জবাব যদি 'হ্যাঁ' হয় তবে কি তাদেরকে 'পুরুষবাদী' বলা যাবে?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হলো 'না'।

যে কেউ কোনো লেভেল ছাড়াই দরিদ্র, অসহায়, ফিলিস্তিনি কিংবা অসহায় নারীর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে পারে, তাদের পক্ষে জনমত তৈরি করতে ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু এ কাজ করার জন্য তাকে নির্দিষ্ট কোনো মতাদর্শের অনুসারী হতে হয় না। প্রতিটি মূল্যবোধ আসে কোনো না কোনো আদর্শিক ভিডি থেকে। যদি আমি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কথা বলি এবং এর প্রতিষেধক হিসেবে বলি যে সবার সমান পরিমাণ সম্পদ থাকা উচিত, ব্যক্তিগত মালিকানা ভুল, তাহলে আমি একজন কম্যিউনিস্ট। তেমনইভাবে যদি আমি ইহুদিদেরকে ঘৃণা করার কারণে, ইহুদি-মাত্রই হত্যাযোগ্য মনে করার কারণে জায়নিজমকে উচ্ছেদ করতে চাই, তাহলে আমি একজন অ্যান্টি-সেমেটিক। একইভাবে, কেউ যদি এ বিশ্বাস করে যে নারী-পুরুষের মধ্যকার সকল পার্থক্য নিছকই সামাজিক বৈষম্য, এভাবে একজন নারী কেবল নির্যাতিতই হচ্ছেন, নারী- পুরুষের সমান অধিকার এবং কর্তব্য থাকা উচিত, তখনই তাকে আমরা নারীবাদী খলি। যদিও নারীবাদের সংজ্ঞা, অবস্থান ও কর্মপন্থা নিয়ে নারীবাদীদের মধ্যেই অনেক মতবিরোধ আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই একটি বিষয়ে একমত। তা হলো-একজন নারী যেকোনো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার রাখে কোনো প্রকার বাধা ছাড়া। এতে পুরুষের কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হলেও কিছু করার নেই। [নারীবাদের (Feminism) শেষে 'বাদ' বা 'ism' শব্দটিই প্রমাণ করে নারীবাদ একটি মতাদর্শ, কোনো কর্মপন্থা নয়]

নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সবকিছুকে সামাজিক বলে উড়িয়ে দেওয়া, জনসমক্ষে নগ্নতার প্রচারের মতো অনাচারকে আমি সর্বাংশে ঘৃণা করি, বর্জন করি। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে নারীর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। অনৈসলামিক পরিবেশ ও রাষ্ট্রে একজন নারী যেসমস্ত বৈষম্য এবং সহিংসতার শিকার হয়, সেসব অত্যাচার থেকে তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমি কাজ করে যাব। তাই বলে কি আমি নারীবাদী?

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা শোচনীয়। তাদের রাষ্ট্রনীতিতে শরিয়াহর কোনো স্থান নেই। এমনকি অনেক আলেম পর্যন্ত শরিয়াহকে অবজ্ঞা করেন! মুসলিম নারীরা এ নাজুক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সংগ্রাম করছেন। আমি এজন্য তাদের দোষারোপ করছি না। যা-ই হোক, যে নারীরা তাদের অধিকার অর্জনের জন্য নারীবাদের দারস্থ হন তাদের উদ্দেশ্যে 'The Dark Knight' চলচ্চিত্রের 'আলফ্রেড' চরিত্রটির একটি উক্তি বলতে চাই, 'তাদের হতাশার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে প্রবলভাবে একটি ধারণা গেলানো হয়েছে। তারা এমন একটি আদর্শকে গ্রহণ করে নিলো যা তারা পুরোপুরি বুঝতেও পারেনি।'

সত্য বলতে, এমন চর্চা ভালো নয়। এগুলো মুসলিমদেরকে ধীরে ধীরে কুফরের দিকে নিয়ে যায়। দিনশেষে এসব মুসলিমরা নিজেদের 'নারীবাদী' বলেই দাবি করে এবং পশ্চিমা মূলধারার স্রোতে প্রবেশ করে, তাদেরই যুক্তি ব্যবহার করে, তাদের বই থেকেই কোট করে এবং তাদের আইকনদেরকেই নিজেদের আইকন বলে দাবি করে। কাফির লেখা হোক বা মুসলিমের, ইসলামবিদ্বেষী হোক বা না হোক, নারীবাদী যেকোনো প্রকাশনাকে তারা সমর্থন করা শুরু করে একপর্যায়ে। তারা কি তাহলে মনে করে যে ইসলাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম নয়? আর তাই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নারীবাদ প্রয়োজন? নাকি মনে করে নারীবাদই ন্যায়বিচারের মানদণ্ড? তারা কীভাবে নিশ্চয়তা দেবেন যে নারীবাদ সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবেই?

মুসলিম নারীবাদীরা যাদেরকে 'পশ্চিমা নারীবাদী' বলে আখ্যায়িত করবে, তারা নিজেদেরকে কেবল 'নারীবাদী'ই বলে। তাদের মতে, নারীবাদ নারীবাদই। কেন বলবে না? তারাই তো নারীবাদের জন্ম দিয়েছে। তারাই নারীবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছে। নারীবাদীরা সমানাধিকারে বিশ্বাসী এমন সব আদর্শকে সমর্থন করে, হোক তা সেকুলারিজম, লিবারেলিজম, কমিউনিজম কিংবা প্যাগান। তারা নারী পুরুষের লিঙ্গের ভিন্নতাকে অস্বীকার করে। তবে এ ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা ভিন্ন। আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহর কাছে নারী ও পুরুষ উভয়ের আত্মার গ্রহণযোগ্যতা সমান। কিন্তু পার্থিব জীবনে তারা অবশ্যই ভিন্ন লিঙ্গের এবং এ কারণে তাদের ভূমিকাও ভিন্ন।

মুসলিম নারীবাদীরা বিভিন্ন সময় 'ইসলামই যে সত্যিকার অর্থে নারীবাদী' তা প্রমাণ করতে ওঠে পড়ে লাগে। কিন্তু পশ্চিমা নারীবাদীরা একে চ্যালেঞ্জ করে। তারা বারবার প্রমাণ করেছে যে ইসলাম এবং নারীবাদ কখনোই এক নয়। তাদের ওয়ার্ল্ডভিউ, মূল্যবোধ ভিন্ন। নারীবাদীদের তোলা আপত্তির মধ্যে আছে পরিবারের নেতৃত্ব, মিরাস (উত্তরাধিকার), ভিন্ন অধিকার, পরিবার, সমাজ, যুদ্ধ ও রাজনীতিতে নারী-পুরুষের ভিন্ন দায়িত্ব ইত্যাদি। এবং প্রতিটি পয়েন্ট সত্য। এভাবে নারীবাদীরাই মুসলিম নারীবাদকে অর্থহীন প্রমাণ করে। তখন মুসলিম নারীবাদীরা নিয়ে আসে ব্যাখ্যার অস্ত্র। তারা নিজেদের মতো করে ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে থাকে। তাদের মতে, ইসলামের হাজার বছরের আলিমদের সিলসিলার প্রায় সবাই ভুলভাবে নারীদের অধিকার, দায়িত্বের বিষয়গুলো ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

পশ্চিমাদের স্বাধীনতার মতাদর্শই কি নারীবাদের জন্ম দেয়নি? এ উন্মাদ স্বাধীনতাই সৃষ্টি করেছে পর্ন ইন্ডাস্ট্রি, বলিউড, গণমাধ্যম। এদের কাজের ফলে মানুষ নারীকে কেবলই একটি যৌন সামগ্রী হিসেবে বিবেচনা করে। নারী মানেই যেন যৌনতা এবং আদিম আনন্দ। মানুষ এখন চরম আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। নারীবাদীরা দাবি করত নারীর স্বাধীনতা নগ্নতায়। যৌন হয়রানি বন্ধে নারীর নগ্নতা কী কাজে এসেছে? বাবা-মা সব ধ্বংস করে রেখেছে আর তারা এখন তাদের সন্তানকে পাঠাচ্ছেন তা ঠিক করার জন্য। আমি একটি প্রশ্ন করি। কোনো দেশ যদি অত্যাচারী কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে থাকে তাহলে তারা কী করবেন? আপনি কি কম্যিউনিজম থেকে মুক্তির জন্য আরও কোনো উদার কমিউনিস্ট পার্টির অধীনে কাজ করবেন? নাকি মানুষকে ইসলামের দাওয়াহ দেবেন যেন তারা সত্যিকার মুক্তি অর্জন করতে পারে?
পশ্চিমা মূলধারার মূল্যবোধ থেকে নিজেদের কিছুটা পৃথক করতে কিছু 'মুসলিম নারীবাদী' একটু ঘুরিয়ে বলেন, সাদা চামড়ার মানুষেরা এবং ঔপনিবেশবাদীরা পশ্চিমা নারীবাদের সংজ্ঞা তাদের 'নারীবাদের' ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বস্তুত এটা সত্য নয়।

দুঃখজনক কিন্তু সত্য, 'মুসলিম নারীবাদীরা' ইতিমধ্যেই তাদের চিন্তাচেতনায় উপনিবেশবাদী চিন্তা গভীরভাবে লালন করে। তারা মনে করে পশ্চিমা আদর্শের রঙে রঙিন হলেই কেবল তারা জাতে উঠতে পারবে। ক্যারিয়ার বা অর্থ উপার্জনের জন্য তারা সানন্দে নারীবাদ গ্রহণ করে নিয়েছে। পশ্চিমা অগ্রগতি দেখে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।

এসকল মুসলিমরা যেকোনো মূল্যে 'নারীবাদ' টার্মটি ব্যবহার করতে চায়। কেননা শব্দটি পশ্চিমা। এভাবে পশ্চিমা প্রভুদের দয়া পাওয়া যায়, তাদের টেবিলে সীট পাওয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে অর্থও উপার্জন করা যায়। এসকল টার্ম কি কোনো কুফর বহন করছে কিনা, কিংবা কোনো নির্দিষ্ট ওয়ার্ল্ডভিউ মুসলিম ভূমিতে প্রচার করতে চাচ্ছে কিনা তাতে কী আসে যায়!

আপনি যে দেশের টাকা ব্যবহার করছেন তার মূল্য নির্ধারণ করবে সে দেশের কর্তৃপক্ষ। আমরা সবাই এটা জানি, মেনেও নিয়েছি। কিন্তু শেষমেশ আপনাকেই দিতে হয় অর্থ।

নিউ টেস্টামেন্টে যিশুর একটা বিখ্যাত বর্ণনা এসেছে। যখন যিশু হলি টেম্পলে বসে আছে, তাঁর বিরোধীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, রোমের প্যাগান রাজা ইহুদিদের ভূমি দখল করে রেখেছে। ধার্মিক ইহুদিদের কি এমন একজন রাজাকে কর দেওয়া উচিত? আমাদের কি এসব পৌত্তলিকদের কর দেওয়া উচিত হবে?'

যিশু ভালোভাবেই তাঁর গোত্রের মানুষদের ভণ্ডামি সম্পর্কে জানতেন। তিনি তাদের বললেন, 'কেন তোমরা আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছ?' এরপর যিশু তাদের একটা ডেনারিয়াস আনতে বললেন। তারা এনে দেওয়ার পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কার ছবি খোদাই করা দেখতে পাচ্ছ তোমরা? কার শিলালিপি?' জবাবে তারা বলল 'সিজারের'। তখন যিশু বললেন, 'তাহলে সিজারের জিনিস সিজারকেই ফিরিয়ে দাও আর আল্লাহকে দাও যেটা তাঁর প্রাপ্য'। (Give back to Caesar what is Caesar's and to God what is God's.) তারা যিশুর উত্তরে বেশ অবাক হয়েছিল। **১৯**

যিশুর উত্তরটা তাদের জন্য যথার্থই ছিল। কারণ তারা সানন্দে রোমানদের মুদ্রা গ্রহণ করত, আনন্দ করত, সবখানে ব্যবহার করত, এমনকি তাদের পবিত্র মন্দিরেও। কিন্তু কর দেওয়া থেকে বাঁচার জন্য তারা যিশুর সামনে এসে নিজেদের সাধু প্রমাণ করতে চায়। সব মিথ্যাচার মানুষেরই সৃষ্টি। যার থেকে যা নেওয়া হয়েছে তা ফিরিয়ে দিতেই হবে। কিন্তু আসমান এবং পৃথিবীর সবকিছুর কর্তৃত্ব শুধু আল্লাহর। মানুষের জীবনযাপন, আইন, অধিকার, দায়িত্ব-কিছুই তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয়।

চলুন, যিশুর মতো করেই আমরা নারীবাদীদেরকে জিজ্ঞেস করি, 'নিজেদের সম্মান, অর্থ উপার্জন ও জাতে উঠার জন্য যে নারীবাদ তা কারা আবিষ্কার করেছে? এর নীতিগুলো কে ঠিক করে দিয়েছে? কে নিজের ছবি সেখানে খোদহি করেছে?' তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এর স্রষ্টা 'পশ্চিমাবিশ্ব'।

যিশুর মতো করেই জবাব দিন, 'পশ্চিমা মূল্যবোধ পশ্চিমাদেরই ফিরিয়ে দাও এবং আল্লাহর ইবাদাত করো এমনভাবে যেমনটা তাঁর প্রাপ্য।'

'তাহলে কি এরা আবার সেই জাহেলিয়াতের ফায়সালা চায়? অথচ যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর চাইতে ভালো ফয়সালাকারী আর কেউ নেই।

সিস্টেমের উপযোগ বনাম ইসলামে সম্মান

নারী নির্যাতনের ইতিহাস প্রমাণ করে, আল্লাহর আইন ছাড়া আর সকল আইনেই নারীরা নির্যাতিত, অপদস্থ হয়েছে। এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য, নিজেদেরকে প্রাসঙ্গিক করে রাখার জন্য নারীদেরকে তিনটি ঐতিহাসিক অবস্থা বা 'ওয়েভ'-এর মধ্য দিয়ে যাওয়া লেগেছে। কিন্তু লাভ হয়নি। বরং আরোপ হয়েছে নতুন নতুন সমস্যা। সেক্যুলার গুরুরা এখন ক্রিটিক্যাল কিংবা ডানপন্থী, এমনকি অনেক সময় ইসলামি ব্যাখ্যা দিয়ে হলেও নিজের অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করে।

নারীবাদের সমস্যা আসলে অর্থনৈতিক। নারীবাদের তত্ত্ব কেবল শ্রমজীবি অধিকারকেই (আসলে ব্যাংকিং সেক্টরকে) লাভবান করেছে তা নয়; বরং এ নিহিলিস্টিক সিস্টেমে তারা নারীদের ওপর হওয়া সত্যিকার জুলুম নিয়ে কথ্য বলতে মোটেই আগ্রহী না। তাদের কোনো ঐশী কর্তৃপক্ষ নেই যে তাদেরকে শিখিয়ে দেবে কীসের দাম কেমন। তারা বস্তুবাদী জীবন আর অর্থনীতিকেই বানিয়ে নিয়েছে তাদের খোদা। তাই তা দিয়েই সব বিচার হয়। অর্থই সব।
আসুন, সেক্যুলার সিস্টেমে এবং ইসলামি সিস্টেমে নারীর সম্মানের তুলনা করি।। আল্লাহর কাছে মানুষের রক্ত, জীবন, সম্পদ, সম্মানের মর্যাদা পৃথিবীর যেকোনো বস্তুবাদী বিষয়ের চেয়ে বেশি। কেবল তাই না, রাসুলুল্লাহর মতে, মুসলিমের রক্তের মূল্য কাবার চেয়েও বেশি। নারীর সম্মানের মর্যাদা এখানে পরিবর্তন হবে না। এ সম্মান অন্তর্নিহিত এবং অতিক্রান্ত, এ সম্মান আল্লাহর দেওয়া। ইসলাম বাদে আর কোনো আদর্শ এমন সম্মান দেয়নি। সেক্যুলার সমাজ তো আরও না। এখানে মানুষ হলো অর্থনীতির চাকা। ইসলাম সবাহিকে নারীর সম্মান বোঝার দিকে আহ্বান করে। এ সম্মান আল্লাহর কাছ থেকে আসা, কোনো মানুষের ঠিক করে দেওয়া না।

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের প্রতিভা ও দক্ষতাকে কাজে
লাগিয়ে। মুসলিম নারীরা আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করেন। কেননা যে তার সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য করে। আল্লাহ যেভাবে জীবনযাপন করতে বলেছেন সেভাবেই জীবনযাপন করে। আর আল্লাহকে আনুগত্যের মাধ্যমে একজন মুসলিম নারী স্বাভাবিকভাবে মানবতারও সেবা করে।

নারীর গর্ভকে সেক্যুলারিজমে হয় হেয় করা হয় বা বস্তুগত উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হয়। কিন্তু ইসলামে গর্ভের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। গর্ভের আরবি হলো রাহিম এবং এর মূলশব্দ বা-হা-মিম আবার আল্লাহর দুটি নাম বা গুণের মূল শব্দ: আর-বাহিম এবং আর-রহমান (অতি দয়ালু এবং পরম করুণাময়)।

ইসলামে তাই একজন গর্ভবতী নারীর সাথে অত্যন্ত কোমল এবং সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা হয়। কিছু আফ্রিকান মুসলিম সম্প্রদায় সন্তান জন্মদানকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। তাদের মধ্যে মা এবং সন্তানের জন্য বিশেষ নির্জনতার ব্যবস্থা করার প্রথা চালু রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

মহান আল্লাহ বলেন, আমার নাম রহমান-দয়াময়। আমি রেহেন (জরায়ু, আত্মীয় সম্পর্ক)-কে সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে তার নাম নির্গত করেছি। সুতরাং যে তাকে (গর্ভ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক) বহাল রাখবে আমিও তার সাথে (রহমতের) সম্পর্ক বহাল রাখব। আর যে তা ছিন্ন করবে আমিও তাকে আমার থেকে ছিন্ন করব।

ইসলামে গর্ভের এমন সুউচ্চ মর্যাদার কারণে নারী-জীবন এবং পরিবারের ধারক হিসেবে মূল্যায়িত হয়। ইসলাম নারীকে বস্তুবাদ এবং এর অন্তহীন, শ্বাসরুদ্ধকর প্রত্যাশা থেকে মুক্ত করে। বরং মাতৃত্বকে ইসলামেই প্রথম প্রকৃত সম্মান দিয়েছে এবং মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করা করেছে। ইসলামে মাতৃত্বকে করা হয়েছে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ। যখন এ গুরুত্ব এবং তাৎপর্য একজন মুসলিমা নারী অনুধাবন করতে সক্ষম হন, তখন তার পার্থিব অন্যান্য সমস্ত উদ্‌বেগ দূর হয়ে যায়। তারা তাদের দেহ-মনকে এসব প্রতিযোগিতামূলক মতাদর্শ এবং এদের মিথ্যা খোদাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পেরে আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করেন।

মুসলিম নারীরা অনুভব করে যে শুধু আল্লাহই তাদের সবচেয়ে ভালো জানেন এবং ভালোবাসেন। অন্য কারও দ্বারা তা সম্ভব নয়।আর যখন নারীবাদের মতো সেক্যুলার ধারণা মুসলিম নারীর অবস্থানকে গর করতে পারে না, তখন তার ফলাফল দাঁড়ায় প্রশান্তি এবং আত্মবিশ্বাস। তাই অধিকাংশ মুসলিম নারীই এ ধরনের আক্রমণের মুখে পড়লে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজের রাস্তায় হাঁটা শুরু করে। এবং এটি নারীবাদী সেক্যুলারিস্টদের ক্রোধ আরও অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

নারীবাদীরা সেক্যুলার সিস্টেমের পণ্য

সেক্যুলারদের 'অধিকার-ভিত্তিক' সমাজে, নারীর দেহ, বৈশিষ্ট্য, অন্তর-সবই এই খাদক সিস্টেমের টার্গেট। পড়ালেখা কিংবা কর্মক্ষেত্রে, এমনকি সেক্যুলার পরিবারগুলোতেও নারীরা তাদের বস্তুবাদ, টাকা-পয়সা দিয়ে মূল্যায়িত হয়। বস্তুবাদী চাহিদায়, আরেক মানুষের লালসা দিয়ে নারীর মূল্য নির্ধারণ করা হয়, হোক তা কর্পোরেট কোম্পানির মালিক। যৌনবিকৃত নারীরাও অর্থ, সম্পদ ও জনপ্রিয়তার মোহে উন্মাদ হয়ে দৌড়াচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে

এসবের পেছনে না ছুটলে মুক্তি নেই। কিন্তু নারী কি আসলেই অন্তর থেকে শান্তিতে আছে? আসলেই কি এগুলোর নারীর প্রকৃত পরিচয়? সত্যিই তো, কীভাবে হবে?

এ প্যারাডাইমে নারী খুবই ভঙ্গুর। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাকে নানান ধরনের আজব বেশ ধারণ করতে হয়। তাঁকে তৈরি করতে হয় শিখিয়ে দেওয়া 'আধুনিক', 'সফল' নারীর ব্যক্তিত্ব। বস্তুবাদ ও জাতে ওঠার আগুনে মশবির পালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে নারী। শিক্ষা, গণমাধ্যম, মুভি কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক ডকুমেন্টারি সবকিছুই নারীকে এমন হয়ে উঠতে উৎসাহ দিচ্ছে, চাপ দিচ্ছে। নারী পরে যাচ্ছে এক অসম লড়াইয়ের মাঝে।

এসব আধুনিক নারীরা যখন নারীবাদী কর্মী, বুদ্ধিজীবী ও প্রোপাগেটর হয়ে যায়, তা হলো সবচেয়ে বেশি দুঃখজনক। এমন সব আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করে ইসলামবিদ্বেষী, খোদাদ্রোহী একদল লোক, নৈতিকতার যাদের কোনো বালাই নেই। নিজেদের মতো নৈতিকতা আরোপ করে মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়ে এবেই স্বাধীনতা বলে আখ্যা দেয় তারা। আসলে 'আধুনিক' নারীরাই জুলুমের হ্যান্ডমেইড। জুলুম চালানোর মূল অস্ত্র হলো নারীবাদ ও সেক্যুলারিস্ট হিউম্যানিজম। দুটো আদর্শ প্রথমেই আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর সকল নীতিমালাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। মানুষ মাত্রই কোনো অথরিটি চায়, কর্তৃপক্ষ চায়। তাই আলিমরা মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আরেক ধরনের পূজা নিয়ে আসে। এ অন্য খোদা হলো সেক্যুলার রাষ্ট্রের সরকার এবং এ বস্তুবাদি পুঁজিবাদী সিস্টেম। এ জুলুম থেকে বাঁচতে চেয়ে আবার এ জালিমদের তত্ত্বই কপচানে। অর্থহীন। এভাবে জালিম আরও শক্তিশালী হয়। যেন সিংহ নিজের মুক্তির জন্য খাঁচার দেয়ালে বারবার আঘাত করছে। কিন্তু এভাবে খাঁচা তো ভাঙছেই না; বরং শেকলগুলো আরও শক্ত হয়ে বসে যাচ্ছে। এদিকে তাঁর সংগ্রাম, অপমানজনক সৌন্দর্য দেখে আনন্দ পায় দর্শক, খাঁচার মালিক উপার্জন করে নেয় কিছু অর্থ।

এসব সেক্যুলার নারীবাদী ধারণাগুলো বদলাবে। সময়ে সময়ে তাদের স্বাধীনতার সংজ্ঞা বদলাবে, সময়ের সাথে সাথে নিজেদেরকে প্রাসঙ্গিক করে রাখার জন্য তারা অনেক কিছুই করবে। দিনশেষে নির্ধারিত হবে না নারীর অধিকার, মুক্তির পথ। সাধারণ নারীবাদীরা আশা করে থাকে সেক্যুলারিজম সবাইকে সুযোগ দেবে এবং এর হাত ধরেই আসবে সমতা ও স্বাধীনতা। এ পন্থায় নারীর ভবিষ্যতে ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নেই।

নারীবাদী নারীদেরকে নিজেদের সত্যিকার মূল্য বুঝতে হবে। তাদের মুক্তির প্রথম ধাপ হলো নারীবাদী আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে বের করে নেওয়া। তাদের বোঝা উচিত, নারীবাদ যাকে মুক্তি বলে তা আসলে দাসত্ব, বন্দিত্ব। নারীবাদ যাকে বন্দিত্ব বলে দেখিয়েছে, শিখিয়েছে তাতেই আসলে মুক্তি। পপ কালচার বা প্রশাসনের শিখিয়ে দেওয়া বুলি মুক্তি না, মুক্তি আছে দাসত্বে, পরম করুণাময়ের দাসত্বে।

বিষয়টি বুঝতে হলে আধুনিক নারীদেরকে তাদের আগের সব মানসিক বেড়াজাল, জাতিগত ঘৃণা, বস্তুবাদী শিক্ষার সব ভূত থেকে বের হয়ে এসে ইসলামকে জানতে হবে। জানতে হবে জানার ও বোঝার মানসিকতা নিয়ে।

নারীরা পরম করুণাময় আল্লাহর অন্যতম সুন্দর এক সৃষ্টি। তারা কেবল আল্লাহর দাসত্ব করতে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতেই জন্মেছে; পুরুষের কাছে নয়। যদি এ সহজ সত্য তারা মেনে নেয়, আল্লাহ ও দ্বীনকে ভালোভাবে জানে, তাহলে তারা বুঝবে কোথায় লুকিয়ে আছে তাদের শক্তি, পৃথিবীর উন্নয়ন আসলেই কীসে নিহিত। এবং তারা কীভাবে ঘৃণার চর্চা না করে শান্তি ফিরে পাবে।

পশ্চিমের পুতুল মালালার বিষাক্ত নারীবাদ

মালালা ইউসুফজাই যে পশ্চিমাদের হাতের পুতুল এটি নিয়ে আর কোনো মুসলিমের সন্দেহ নেই। তাকে ব্যবহার করে আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন, গণহত্যাকে 'বৈধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। মালালাকে পূর্ব ও পশ্চিমের সেতু হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যেন পূর্বের মানুষ দিয়েই পূর্বে পশ্চিমের সংস্কৃতি রপ্তানি করা যায়। কিন্তু তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন নারীবাদের মাধ্যমে।

নারীবাদীরা দাবি করে, সব পুরুষই সাধারণভাবে আক্রমণাত্মক এবং নারীদের প্রতি সহিংস। এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা। এসব নারীবাদীরা সবসময় নারী নির্যাতনের কিছু বিচ্ছিন্ন উদাহরণ টেনে এনে সমস্ত পুরুষকে এক পাল্লায় নিয়ে আসে। মজার ব্যাপার হলো, যখন কেউ সামগ্রিকভাবে কোনো গোষ্ঠীকে অহেতুক তকমা দিয়ে দেয় তখন নারীবাদীরাই তাদেরকে 'বর্ণবাদী' বলে আখ্যা দেয়। তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, লংমার্চ করে।

পুরুষরা সহজাতভাবেই নারীদের প্রতি বিনয়ী হয়। পুরুষের মধ্যে আল্লাহ গাইরাত ও দায়িত্ববোধ দিয়ে দিয়েছেন। যার কারণে নিজের বা আশেপাশের যেকোনো পরিবারের বিপদে তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায়। এমনকি তা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও। অন্যদিকে নারীদের মধ্যে এ প্রবৃত্তিটি নেই। নারীদের সহজাত বৈশিষ্ট্য হলো বাচ্চাদের সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত থাকা। পরিবারের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য যেকোনো কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ার মতো পুরুষালি বলিষ্ঠতা তাদেরকে দেওয়া হয়নি।

বোঝাই যাচ্ছে, কেন আল্লাহ পুরুষকে নেতৃত্বের ভূমিকায় দিয়েছেন, নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব আরোপ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তাদেরকে এ কাজের উপযুক্ত করেই সৃষ্টি করেছেন।

তবে পুরুষের এ প্রবৃত্তির সুযোগ নেয় নারীরা। কয়েক ফোঁটা মেকি অশ্রু ফেলে এবং নিদারুণ কষ্টের কিছু মিথ্যা গল্প শুনিয়ে সুনিপুণভাবে পুরুষদের বশীভূত করে তারা। পুরুষ শিকার হয় প্রবঞ্চনার। তাদের এসব ছলনা পুরুষদের গাইরাতকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। তারা তখন সেই দুর্দশাগ্রস্ত মেয়েটিকে উদ্ধার করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। অথচ বাস্তবে হয়তো তাকে তেমন কোনো সমস্যারই সম্মুখীন হতে হয়নি।

নারীবাদীরা এভাবেই প্রোপাগান্ডা করে। তারা আজীবন দুষ্ট, নিকৃষ্ট, বিকৃত পুরুষদের নির্যাতনের শিকার হওয়ার দাবি করে মায়াকান্না করে। কয়েকটি নির্যাতনের ঘটনাকে চেরিপিক করে তারা সাধারণ হিসেবে চালিয়ে দেয়। পুরো সমাজ যেন উন্মাদ হয়ে আছে নারীকে ধ্বংসের জন্য। তারা কিছু দাবি করে সবার হাসির পাত্র হয়, 'কাউকে Policeman বলবেন না। এখানে উইম্যান কোথায়? আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাদের এসব উদ্ভট প্রচারণায় কিছু পুরুষকেও শামিল হতে দেখা যায়। এ সকল হোয়াইট নাইটরা ছুতো পেলেই পুরুষতন্ত্রের সমালোচনা করে। তাদের কঠোর সমালোচনা করা উচিত। তাদের কারণেই নারীবাদীদের কাজ সামাজিক বৈধতা পায়।

বোঝার চেষ্টা করুন, ভাই। মালালায় ফিরে আসি।

সমস্ত মুসলিম পুরুষের ওপর এ ধরনের নারী আগ্রাসনের মূর্তপ্রতীক হলো মালালা। তিনি এটা বেশ উপভোগ করেন বলা যায়। তিনি মনে করেন (পশ্চিমা কুফফারদের সাথে বসে) জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করা উচিত, লিবারেলদের মতো সর্বোচ্চ আনন্দের পেছনে ছোটা উচিত, যেখানে বিশ্বজুড়ে তাঁর মুসলিম ভাই-বোনরা প্রতিনিয়ত নিপীড়ন এবং ড্রোন হামলার শিকার হচ্ছে।

২০১০ সালে উইকিলিকস একটি প্রতিবেদনে দাবি করে' সিআইএ আমেরিকার আগ্রাসনকে বৈধ করতে নারীবাদকে কাজে লাগাচ্ছে। প্রতিবেদনটি অনুযায়ী, নেদারল্যান্ডস আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করলে, অন্যান্য দেশগুলো খুব সম্ভবত তা-ই করবে। সিআইএ চেষ্টা করছে নারীবাদের মাধ্যমে দশ বছর ধরে ন্যাটোর চালানো আফগানিস্তানের আগ্রাসনকে ইউরোপীয়দের নিকট বৈধ করে তুলতে।

প্রতিবেদন থেকে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়:

'যদি দাবি করা হয়, তালিবানের উত্থান ওই এলাকায় অনেক কষ্টে অর্জিত নারী শিক্ষার উন্নতিকে উলটো দিকে ঠেলে দিতে পারে, তাহলে ফ্রান্সের সেক্যুলার নাগরিকরা গৎবাঁধা এই আগ্রাসনকে সমর্থন দেওয়া শুরু করবে। অর্থাৎ এই ধরনের কারণসমূহ রক্তাক্ত ইনভেসন এর সমর্থন জোগাড় করে দেয়, কারণ তারা এই ইনভেশনকে দেখে 'কল্যাণময় সাধনা' হিসেবে কিছুদিন আগে এক বক্তব্য দিয়ে তিনি আবার আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেন। সেয়ানে তিনি জোরালোভাবে বলেন-

'আমি জানি না মানুষ আসলে কেন বিয়ে করে। আপনি যদি নিজের জীবনে কোনো সঙ্গীর প্রয়োজন অনুভব করেন, তবে কেন একটি কাগজে আপনাকে স্বাক্ষর করতেই হবে? এটি কেন শুধু একটি পার্টনারশিপ হতে পারে না?'

নির্বোধ মন্তব্য! তিনিই-না গত বছর অক্সফোর্ড থেকে স্নাতক হয়েছেন? অবশ্য এতেই অনেককিছু বোঝা যায়। পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজকাল প্রকাশ্যে উগ্র নারীবাদীদেরকে উৎসাহিত করছে। এ নারীবাদীরা উন্মুক্ত যৌনতার প্রচার করে এবং LGBT আন্দোলনে মার্চ করে।

মালালা সকল কন্যাসন্তানের বাবাদের (এবং ভবিষ্যতে যারা কন্যাসন্তানের বাবা হবেন তাদের) জন্য একটি চরম সতর্কতা। আপনি কি চাইবেন যে আপনার মেয়ে বড় হয়ে ব্যভিচারের সমর্থক হোক? আপনি কি চাইবেন যে আপনার নেয়ে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের পুতুল হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করুক? যদি তা না চান, তবে তাকে নারীবাদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করুন। তার মাথা থেকে নারীবাদী চেতনা যেমন 'দৃঢ়', 'স্বাধীনচেতা', 'স্বাবলম্বী' নারীকর্মী হওয়ার চিন্তা দূর করুন। আর কত নির্বোধ থাকবেন? সচেতন হোন এবং তাকে একজন বাধ্য স্ত্রী, একজন স্নেহময়ী মা হবার শিক্ষা দিন। যেন পরিবারের সেবা, সন্তানের লালনপালন করার মধ্য দিয়ে সে আল্লাহর দাসত্ব করতে পারে।

উম্মাহর অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন এমন আদর্শ নারীর। মালালার মতো নারীবাদীরা উম্মাহকে কেবল পিছিয়েই দেবে।

আফগান নারীদের জন্য শেতাঙ্গদের কান্না

আফগানিস্তানে War on Terror ঠিক সেভাবেই শেষ হলো, যেভাবে তা শুরু হয়েছিল- আফগান নারীদেরকে নিয়ে শেয়ালের কান্না দিয়ে। অবশ্য আমেরিকার মানসিকতা বোঝা যাচ্ছে। মিসাইল ছোড়ার আগে কিংবা মুসলিমবিশ্বে বোম ফেলার আগে তাদের সাধারণ মানুষের সামনে কিছু একটা তুলে ধরা দরকার ছিল। জনগণ যেন যুদ্ধের বিরোধিতা না করে, যুদ্ধকে সমর্থন দেয়-সেজন্য তাদের কাছে কিছু প্রোপাগান্ডা ছড়ানো দরকার হয়। এভাবে জনগণ পক্ষে থাকবে, প্রতিরোধ আসবে না এবং যুদ্ধবিরোধী যেকোনো তর্ককে দমন করা যাবে।

আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ এবং পরবর্তী সময়ে সেখানে সামরিক অভিযান চালানোর পেছনে সবচেয়ে বড় অজুহাতটি ছিল আফগান নারীদের বন্দিদশা। তারা বলে, তারা নাকি আফগান নারীদের অবস্থান উন্নয়ন ঘটাতেই এমন হামলা করছে। পশ্চিমের সাধারণ মানুষের 'সাদা আধিপত্যবাদী' আবেগকে আর কী দিয়ে উসকে দেওয়া যাবে? যুদ্ধ বৈধ করার জন্য এর চেয়ে সেরা অজুহাত আর কী হতে পারে? আফগান নারীদেরকে 'মুক্ত' করার জন্য একাট্টা হয়ে যায় নাইটস টেম্পলারদের উত্তরসূরিরা। সামরিক ইন্ডাস্ট্রিগুলো স্লোগান দেয়, 'নারীদেরকে রক্ষা করুন!' এর সাথে মিলিয়ে স্লোগান দেয়, 'আমাদের সৈন্যদের সমর্থন করুন!' (ব্রিটিশরা বলবে, 'আমাদের ছেলেদেরকে সমর্থন করুন!') কিন্তু এর পেছনের বার্তা সবাই জানে, কিন্তু কেউ স্বীকার করে না, 'আমাদের (সাম্রাজ্যবাদী) যুদ্ধকে সমর্থন করুন!'

মালালার আলোচনায় আগের অধ্যায়ে সিআইএর প্রোপাগান্ডা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বুশ প্রশাসন একে কেবল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধই না; বরং নারীর সম্মান ও অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার যুদ্ধ বানিয়ে নিয়েছে। তৎকালীন সময়ের ফার্স্ট লেডি লরা বুশ তাৎক্ষণিক এবং সরাসরি আফগান নারীদের অবস্থা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষায়, এটি 'চরম জুলুম'। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী চেরি ব্লেয়ার আফগান নারীদের পক্ষে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, ক্যাম্পেইন করেছিলেন।

যখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তখন পশ্চিমের সাধারণ মানুষের মাথায় ইতিমধ্যেই তালিবানের অধীনে থাকা নারীদের দুর্দশা একেবারে সেঁটে ছিল। পশ্চিমা মিডিয়া নিজেদের মতো করে তালিবানকে চিত্রায়িত করে। বিরাট বিরাট বাড়িওয়ালা বাদামি রঙা সব লোক, মাথার বিশাল পাগড়ি আর গায়ে বিরাট কাসুলি পর্য। তাদের মানসিকতা অনেক উগ্র। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ মুশোরলি হাতাযাচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে অসভ্য, গরিব জনগোষ্ঠীর সাথে যারা '৮০র দশকের অস্ত চালায়, ইংরেজি বলতে জানে না এবং পশ্চিমের 'স্বাধীনতা'কে ঘৃণা করে।

২০১০ সালে আমেরিকার সেক্রেটারি অব স্টেইট হিলারি ক্লিনটন আফগান নারীদের অধিকার রক্ষার শপথ নেন। আফগান নারীদের ওপর বোন। মেরে মেরে তাদেরকে রক্ষার ইতিহাস লিবারেল নারীবাদীদের আছে। নারীবাদী স্কলার গনোত্রী চক্রবতী স্পিভাক সুন্দরই বলেছেন, 'আফগানিস্তানে সাদা পুরুষরা বাদামি পুরুন থেকে বাদামি নারীদেরকে রক্ষার অভিযান শুরু করল'। মজার বিষয় হলো, জায়গানি নারী ও বালিকাদেরকে রক্ষা করতে গিয়ে অগণিত আফগান নারীকে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় করে দিয়েছে আমেরিকা। আমেরিকার দীর্ঘতম এ যুদ্ধে ৭০২০০০-এর বেশি সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে, পঙ্গু হয়েছে আরও অগণিত। যাব বেশিরভাগই নারী ও শিশু। ১১০০।

আজ ২০২১-এ এসেও আমরা খুব ভিন্ন কিছু শুনছি না। আজকে এত ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, মানুষের ওপর গণহত্যা এগুলো সবকিছুই আমরা দেখেছি মানবতাবাদ এবং নারী অধিকারের মুখোশে। যুদ্ধ শুরুও হয়েছিল ক্লিনটনের এমন ঘোষণাতেই। অ্যান্টি এফজিএম ক্যাম্পেইনার নিমকো আলি সাম্প্রতিক সময়ে টুইট করেন, 'মিলিয়ন মানুষ এখন পশ্চিমা হস্তক্ষেপ খুব করে চাইছে'। আফগানিস্তানে সৈন্য রেখে দেওয়ার একটি নারীবাদী যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে। কিন্তু কেন? যারা অলিবানের 'কল্পিত' ভবিষ্যৎ গণহত্যা নিয়ে এত চিন্তিত, তারা কেন আমেরিকার ২০ বছর ধরে করে যাওয়া হত্যাযজ্ঞের কোনো প্রতিবাদ করছে না?]

আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের এ দুই যুগে, ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো তাদের জিহ্বা দিয়ে নারী অধিকারের বুলি আওড়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদেরকে তেমন কোনো রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। কিন্তু বক্তব্য চলছিল। ২০১১ সালে, ওয়াশিংটন পোস্ট আমেরিকার নারী অধিকারের মুখোশ নিয়ে আলোচনা করেছে। তারা ভেঙে ভেঙে দেখিয়েছে, আমেরিকার নারী অধিকার কেবল মুখোশ ছিল, বাস্তবে তাদের এজেন্ডা থেকেই বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়েছে। আর্টিকেলে একজন সরকারি কর্মকর্তার উক্তিও উল্লেখ করা হয়েছে, 'এসব ফালতু বিষয় আমাদের আসল কাজকে পিছিয়ে দিচ্ছে' (All those pet rocks in our rucksack were taking us down)। আফগানিস্তানে ২০১০ অর্থবছরে আমেরিকার ফান্ডিং ছিল ১৬,৭৪৮ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু ২০২১ অর্থবছরে তা নেমে এসেছে ৩,১২০ মিলিয়ন ডলারে।

পশ্চিমের হস্তক্ষেপকে দেখানো হয় একটি উদারতা হিসেবে। তাদের স্লোগান, প্রোপাগান্ডা কিংবা মুভিতে তাদেরকে দেখানো হয় মানুষকে মুক্ত করার শক্তি হিসেবে। এ প্রচণ্ড জটিল জিওপলিটিক্যাল আলোচনায় নারীকে কেবল নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। আমেরিকার এই সভ্যকরণ মিশনের অর্থ হলে আফগান মহিলাদের বিভিন্ন চাহিদা এবং অধিকারগুলোকে অস্পষ্ট এবং ঘোলাটে করে দেওয়া এবং স্থানীয় মহিলারা যেন তাদের নিজ আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তা নিশ্চিত করা। বিশটি

বছর এবং ৩ ট্রিলিয়ন ডলার খরচের পরেও দেশটি একটি ধ্বংসস্তূপ। অক্টোবরে জাতিসংঘ ঘোষণা করেছে ২০১৪ সালে আফগানিস্তানে সাধারণ মানুষের মৃত্যু সবচেয়ে বেশি ছিল আফগানিস্তানে। ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অন্তত ২৭৯৮ জন সাধারণ জনগণ নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে ৫০০০ এর বেশি মানুষ। Gallup এর জুলাইয়ে সংঘটিত সমীক্ষায় বলা হয়েছে, আফগানিস্তানে মানুষের জীবনের মূল্য কম। অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে, অন্য যেকোনো বছরের চেয়ে সহজে, দ্রুত নিহত হচ্ছে আফগানরা

যখন সিলেক্টেভ মানবতা উপচে পড়ে

যেসকল মানুষরা আফগানিস্তানের নারীদের তথাকথিত দুর্দশা দেখে অনেক হায় হুতাশ করছিল, আশা করি তারা সেখানকার জীবনমরণ সমস্যা নিয়েও একইভাবে চিন্তিত হবে। পশ্চিমের হস্তক্ষেপের কারণে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে আফগান জনগণের তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করবে। আফগানিস্তানের এ যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে বিভিন্ন সামরিক ইন্ডাস্ট্রি। যুদ্ধ যত চলবে ততই তাদের লাভ, যুদ্ধ বন্ধ হলে ব্যবসা শেষ। তাদের লাভ হয়েছে ট্রিলিয়ন। এ যুদ্ধের আসল সফলতা মোটেই নারীর নয়; বরং সামরিক কন্ট্রাক্টর, অস্ত্র ব্যবসায়ী, মিডিয়া এবং যেসব রাজনীতিবিদ অবসরে গিয়ে বিভিন্ন প্রতিরক্ষা ইন্ডাস্ট্রিতে যান তাদের।

আফগানিস্তানের প্রশ্ন আসলে জিজ্ঞেস না করে পারা যায় না, আফগান নারীদের জন্য এত যে অশ্রু, তারাই কেন পশ্চিমাদের সব যুদ্ধাপরাধ ধামাচাপা দিলো? ব্রিটিশ যোদ্ধাদের শিশুহত্যা, জেলে নির্যাতন করে হত্যা, নির্যাতন, যৌন নির্যাতন- সহ আরও অনেক শিউরে ওঠা তথ্য মিডিয়ায় খুব বেশি দেখাই যায় না, সেগুলোর জন্য সহানুভূতি তো পরের কথা। অথবা ভেবে দেখুন যখন অস্ট্রেলীয় এলিট সেনারা ৪০০ জন প্রত্যক্ষদর্শীর সামনে অসংখ্য কয়েদি, কৃষক এবং বেসামরিক লোকদের হত্যা করেছিল। সেই সাথে তারা আরও গুরুতর অপরাধের সাথে জড়িত ছিল, যেমন-

-জুনিয়র সৈন্যদেরকে তাদের প্রথম খুন শুরু করতে বলা হয়েছে কারাগারের বন্দিদের দিয়ে। এ কাজের নাম, 'Blooding'.

-সাধারণ আফগান নাগরিকদের মৃতদেহের পাশে বিভিন্ন অস্ত্র ও পোশাক দিয়ে দেওয়া যেন তাদেরকে জঙ্গি মনে হয় এবং নিজেদের অপরাধ লুকানো যায়।

বিভিন্ন ঘটনা যেগুলো যুদ্ধাপরাধের সংজ্ঞায় পড়ে যায়। বিভিন্ন সময় 'বর্বর জিজ্ঞাসাবাদ'-এর নামে হওয়া সব যুদ্ধাপরাধ। ১৯৯১ সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনীর যুদ্ধাপরাধের ব্যাপারে যখন International Criminal Court একটি তদন্ত শুরু করে, তখন আমেরিকা তাকে যেভাবে 'শাস্তি' দিয়েছিল তার কী হবে? অপরাধী যেই হোক না কেন, যখন সাধারণ আফগান নাগরিকদের প্রতি হওয়া সকল অন্যায়ের প্রতি ক্রোধ এবং উদ্‌বেগ একই রকম দৃঢ় হবে, কেবল তখনই আফগানিস্তানের জনগণের জন্য লিবারেলদের এই মায়াকান্নার মূল্য থাকবে।

মাতৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ: মুসলিম নারীবাদের অবস্থান

বিয়ে নাকি ক্যারিয়ার? আধুনিক বিশ্বের অসংখ্য মুসলিম তরুণী এ প্রশ্নে এসে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। তাদেরকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার কেউ থাকে না। একপর্যায়ে তারা কাফিরদের মতাদর্শ অনুসরণ করতে থাকে। এ যাত্রার শেষ হয় দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে।

অনেক মুসলিম নারীই তোতাপাখির মতো নারীবাদের বুলি আওড়ায়। জীবনের দীর্ঘ একটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তারা অবাক হয়ে ভাবে, 'আমি এত একা এবং নিঃসঙ্গ কেন?' এই পয়েন্টে এসে অনেকেই মুসলিম পুরুষদের ভীতু এবং কাপুরুষ বলা শুরু করেন। মেয়েদের সকল পশ্চাৎপদতার পেছনে পুরুষই একমাত্র কারণ ইত্যাদি ভয়াবহ সব অপবাদ দিতে থাকেন। মুসলিম পুরুষরা নাকি 'ক্ষমতাবান' স্বাধীন মুসলিম নারীদের সাথে চলতে ভয় পায়!

আমাদের দ্রুত সজাগ হতে হবে। বর্তমানে আরও বেশি। কেননা ধর্মকে বর্জন হোক বা ফেমিনিজমের 'ইসলামি নাম দিয়ে হোক, অসংখ্য মুসলিম নারী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ব্যক্তিজীবনে এসব বিষাক্ত, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট মতাদর্শ প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

যেসব নারীরা হালাল ক্যারিয়ার বেছে নিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো কথা নেই। চরম আর্থিক দুরবস্থার কারণে অন্য কোনো উপায় নেই এমন অনেক বোন আছেন। তাদেরকে নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। বরং আমার ক্রোধ এমন এক ব্যবস্থার প্রতি যেখানে ক্যারিয়ারই নারীর একমাত্র মূল্য, এর বাইরে নারী যেন কিছুই নন। ফলস্বরূপ নারীকে আজ এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

আমি নিজেকেও এ প্রশ্ন নিয়ে লড়াই করতে হয়েছে। ঠিক আছে আমি একজন স্ত্রী এবং মা, কিন্তু এটাই কি যথেষ্ট? নারী হিসেবে আমি যোগ্য তো? বেশ কয়েক বছর পর আমি বুঝতে

পেরেছি, আসলে এ প্রশ্নটা নিজেই বিষাক্ত। একজন ভালো স্ত্রী এবং একজন ভালো মা হওয়ার চেয়ে সেরা আর কী আছে? এর চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং আর কি হতে পারে? আর এর চেয়ে বেশি পরিপূর্ণতা আর কীসের মাধ্যমে আসতে পারে? একটি সুসংহত, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ পরিবারই তো ধীরে ধীরে গড়ে তুলবে একটি সুদৃঢ় মুসলিম উম্মাহ। এর প্রতিষ্ঠায় কাজ করার চেয়ে বেশি কার্যকরী বিষয় আর কী আছে?

নারীবাদ এতে খুশি না। তাদের মতে, আমাদেরকে 'আরও বেশি কিছু' হওয়া প্রয়োজন। এভাবেই নাকি 'নারীদের সম্ভাবনা পূরণ করা যাবে'। তাদের মতে, নারীর আসলে স্বামী এবং সন্তানকে সময় দেওয়া উচিত না। তাদের বরং উচিত তাদের মূল্যবান সময় দিন, সপ্তাহ, এমনকি বছরও অর্থ, খ্যাতি এবং নেতৃত্ব অর্জনের লক্ষ্যে ব্যয় করা। এভাবে নারীর কিছু অর্জন হয় বটে, কিন্তু হারায় অনেক বেশি কিছু। যেখানে পুরো সিস্টেমই নারীদেরকে এসব শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর, আমরাই পারি বদলাতে। কেননা, তাদের ষড়যন্ত্র আমাদেরকে নিয়েই। আমরাই পারি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে।

দুঃখজনকভাবে, কিছু মুসলিম এ কাজই করছেন। এ বিষাক্ত মানসিকতা ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

তাঁরা চার

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বিনি ঈমান এনেছিলেন তিনি হলেন খাদিজা রা.। তিনিই ছিলেন প্রথম মুমিন। ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যদি দুটি বিষয় এক করে দেখা হয় তাহলে বোঝা যায়, খাদিজা রা. ছিলেন এই কাফিলার প্রথম অভিযাত্রী। তিনি ছিলেন পুরুষদের চেয়েও অগ্রগামী।' তিনি রাসুলুল্লাহ -এর ওপর ঈমান আনা প্রথম মানুষ। খাদিজার রা. কোন গুণটি তাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে? কেন তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চারজন মহিলার একজন? এটি কি তার ক্যারিয়ারের জন্য? নাকি তার ইলমের জন্য? আমাদের বোনদের বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে ভেবে দেখা উচিত।

মারইয়াম আ.. আসিয়া আ., ফাতিমা রা.-এ চারজন নারীর মধ্যে আমরা সাধারণ যে বৈশিষ্ট্য দেখি তার মধ্যে প্রথমটি হলো, তারা প্রত্যেকেই দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন। তাদের আল্লাহর ওপর আস্থা ছিল খুবই শক্তিশালী। আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস ইয়াকিনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। ইয়াকিন হলো ঈমানের এমন পর্যায় যেখানে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা তাদের ঈমানকে টলাতে পারে। এটি এমন অবস্থা যখন মানুষ যা দেখে বা শোনে তার চেয়েও বেশি সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। বিষয়টি এমন যে আপনি সালাতে

আপনার সামনে আল্লাহকে দেখছেন কিন্তু তিনি সেখানে নেই। চারজনই সে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

আমরা যেকোনো একজনের কথাই বলি। ধরুন আসিয়া রা.। তিনি ছিলেন ফিরআউনের স্ত্রী। একজন নারী চাইতে পারে এমন সবকিছু উনার সামনে ছিল। একজন দুনিয়াদার নারী অনেক সম্পদ, বিলাসী জীবন, ক্ষমতাবান স্বামী, দাস- দাসী চাইতে পারে। এমন সবকিছুই তাঁর ছিল। কিন্তু আসিয়া রা. সবকিছুই আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাকে এমন একটি প্রাসাদে রেখেছিলেন পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর চেয়ে বিলাসী আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তিনি আল্লাহকে বললেন,

'আল্লাহ, আমি জান্নাতে তোমার পাশে একটি বাড়ি চাই।'

[সুরা আত-তাহরিম: ১১]
আল্লাহ তাকে সম্পদ, ক্ষমতাবান স্বামী সব দিয়েছেন। কিন্তু নাহ। তিনি এসবকে পায়ে ঠেলেছেন। বরং তিনি সেই স্বামী থেকেই আশ্রয় চেয়েছেন,

'হে আল্লাহ, আমাকে ফিরআউনের কর্মকাণ্ড থেকে হিফাজত করুন।'

[সুরা আত-তাহরিম: ১১]

তাঁর এমন ত্যাগ ও আল্লাহর প্রতি এমন আস্থাই তার ইয়াকিন প্রকাশ করে। খেয়াল করুন, আসিয়া আ. কিন্তু খুবই খারাপ ও জঘন্য পরিবেশে থাকতেন। তার চারদিকেই ছিল সবাই কাফির ও জালিম। এতকিছু সত্ত্বেও তিনি তাঁর অন্তর আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন। এটিও শক্তিশালী ঈমানের লক্ষণ। অবস্থা যাই হোক, আপনিই বিজয়ী হবেন। আল্লাহ আপনার প্রতি সৎ থাকবেন। বাকিদের ব্যাপারটাও এমন। সুতরাং তাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তারা ইয়াকিনের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

দুই নম্বর যে বৈশিষ্ট্য আমরা দেখি তা হলো, তারা প্রত্যেকেই একজন ভালো মা ও একজন ভালো স্ত্রী ছিলেন।

নারীবাদী বা নারীবাদী চিন্তা লালনকারী বোনদের হয়তো এ কথাটি ভালো লাগবে না। কিন্তু বাস্তবতা এটাই। তারা কেউই তাদের ক্যারিয়ারের জন্য সমাদৃত ছিলেন না। তাদের মধ্যকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো তারা ভালো মা ও ভালো স্ত্রী ছিলেন। আসিয়া আ. ও মারিয়াম আ.

দুজনই দুজন রাসুলের অর্থাৎ মুসা আ. ও ঈসার আ. মা ছিলেন। খাদিজা রা. সম্মানিত হয়েছিলেন রাসুলুল্লাহ -কে সাহায্য করে। তিনি তাঁর ব্যবসার জন্য সমাদৃত হননি। বরং এ ব্যবসা তার কোনো কাজে আসেনি। তিনি রাসুলুল্লাহ -এর একজন ভালো স্ত্রী ছিলেন। তিনি চরম দুরাবস্থায়ও রাসুলুল্লাহ -কে সাহায্য করে গিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ খাদিজা রা. কে পাশে পেয়েছেন সবসময়।

ফাতিমাও রা. ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী স্ত্রী। একটা উদাহরণ দিই। আলী রা. শুনলেন যে রাসুল ৬ বেশ কিছু দাস পেয়েছেন। তিনি ও ফাতিমা রা. মনস্থির করলেন, তারা রাসুলুল্লাহ -এর কাছে যাবেন ও দাস চাইবেন। ফাতিমার রা. খুব কষ্ট হচ্ছিল ঘরের কাজ করতে। তো তারা আয়েশার রা. কাছে তাদের সমস্যা খুলে বললেন। ফাতিমাকে রা. খুব কঠিন পরিশ্রম করতে হতো। পানি তোলা, পেষণ-সহ অনেক কঠিন সব কাজ। পরবর্তী সময়ে আয়েশা রা. রাসুল -কে জানানোর পর তিনি আলি রা.-এর বাসায় যান। আলি রা. হাদিসটি বর্ণনা করছেন। তিনি বললেন, "আমরা যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় গেলাম তখন রাসুল এসে হাজির হলেন। আমরা তাকে দেখে ওঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু রাসুল ও বললেন, 'যেখানে আছ সেখানেই থাকো'। তারপর রাসুলুল্লাহ আমাদের মাঝখানে এসে বসলেন। তিনি আমাদের দুজনকেই স্পর্শ করে ছিলেন।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে রাসুল ও ফাতিমাকে রা. এতই ভালোবাসতেন যে তিনি বলেছিলেন, 'ফাতিমা আমার অংশ। যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কই দেয়। যা তাকে আনন্দ দেয় তা আমাকেও আনন্দ দেয়।' ফাতিমা রা. ছিলেন রাসুলুল্লাহ -এর একমাত্র জীবিত সন্তান। তাই রাসুলুল্লাহ ও চাইতেন উনার মেয়ে যেন সর্বোত্তম জীবন পায়, সবচেয়ে ভালো কিছুই অর্জন করে।

রাসুল -এর কাছে দাস ছিল। কিন্তু তিনি কি দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, 'আমার কাছে তোমার জন্য দাসের চেয়েও ভালো কিছু আছে। তুমি ঘুমাতে যাওয়ার আগে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার পড়ে নাও। এটাই তোমার জন্য ভালো।' ফাতিমা রা. পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষটির সবচেয়ে ভালো কন্যা। রাসুল ও জানতেন হাত খসখসে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ফাতিমা রা. ঘরের কাজ করতেন। তার হাতের চামড়া মোটা হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও রাসুল বলেছেন, 'যা করছ তাই করতে থাকো।' তাকে দাসের বদলে আমল শিখিয়ে দিলেন।

আলি রা. পরবর্তী সময়ে বলেন, ফাতিমা রা. এত কঠোর পরিশ্রম করতেন যে হাত প্রায় ছিঁড়ে যাওয়ার অবস্থা হওয়া পর্যন্ত তিনি ময়দার চরকা ঘুরাতেন। ঘাড়ে দড়ির দাগ পড়া পর্যন্ত তিনি কুয়া থেকে পানি তুলতেন। পোশাক নোংরা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি ঘর পরিষ্কার করতেন।

চেহারায় ধোঁয়ার ছাপ ফেলা পর্যন্ত তিনি রান্না করতেন। ইনিই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির মেয়ে। রাসুলুল্লাহ জানতেন তাঁর কী অবস্থা। বিনিময়ে তিনি কী পেলেন? তিনি হয়ে উঠলেন পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীদের একজন। জ্ঞানের মাপকাঠিতে আয়িশা রা. ছিলেন খাদিজা রা. ও ফাতিমা রা. থেকে অনেক ওপরে। কিন্তু তাও তিনি খাদিজা রা. ও ফাতিমার রা. সমকক্ষ হতে পারেননি।

আমাদেরকে অবশ্যই জ্ঞানার্জন করতে হবে। আমরা ইসলামি প্রতিক্রিয়াশীল হব না। কিন্তু জেনে নেয়া উচিত কোথায় আমাদের সত্যিকার সম্মান। কোথায় আমাদের পুরস্কার। সবাই সবার দায়িত্ব পালন করবো, সর্বোচ্চ জ্ঞানার্জন করবো। কিন্তু প্রাধান্যের জায়গাগুলোকে হারিয়ে ফেলব না। আসুন সে পথেই হাঁটি যে পথে চলে গিয়েছেন খাদিজা রা., ফাতিমা রা.. আসিয়া রা., মারইয়াম রা.। আল্লাহ তাদেরকে কবুল করুন।

নারীশিক্ষা

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শিক্ষা অর্জনের নির্দেশ দেয় এবং উৎসাহ প্রদন করে। কুরআন-হাদিসে এমন কোনো উক্তি নেই যা নারীর শিক্ষা গ্রহণকে নিদ্ধি করে কিংবা নিরুৎসাহিত করে। ইসলামের ইতিহাসে অনেক আলিমা, মুহাদ্দিস, ফকিহা ও খ্যাতনামা নারীদের দৃষ্টান্ত আছে। যেই সাতজন মহান ব্যক্তিত্বের মধনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের প্রজ্ঞা গণমানুষের কাছে পৌঁছেছে, তাদের একজন হলেন উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রদিয়ার আনহা। এমনকি ইসলামি ইতিহাসে নারীরা ফতোয়া প্রদানের খেদমতও আজন দিয়েছেন।

ইসলামে নারীর শিক্ষা কোনো গৌণ বিষয় নয়; বরং এটি একটি অংশরী বিষয়। এজন্য কেউ নারীর শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করতে পারে না। এমনকি কোনে নারী যদি উচ্চশিক্ষাও অর্জন করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেওয়া বৈধ হবে না। করে সেই শিক্ষা, তার পরিবেশ ও উদ্দেশ্য অবশ্যই নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্টস্স ও নারিত্বের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া যাবে না। ইসলামি শরিয়াহর নীতিমালা ও চাহিদার পরিপন্থি হওয়া যাবে না। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ক্রুটি এটাই যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাউকেই এই শিক্ষা তাদের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন করে না। তাদের আদর্শ পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা এখানে নেই।

বিশেষ করে সমাজে নারীশিক্ষার যেই আস্ফালন, তার পুরো প্রজেক্টই পশ্চিমাবান্ধব। এই শিক্ষা প্রজেক্টের অন্যতম এজেন্ডা হলো, নারীকে কেবল একজন উৎপাদক যন্ত্র হিসেবে আমদানি করা। প্রচলিত নারীশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, নারীকে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত করা, নারীকে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান হওয়ার এক অপ্রাকৃতিক ও ঘৃণ্য প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেওয়া।

উপনিবেশ আমলে যখন মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন শায়খ মুস্তফা আস সবারি রহিনাহুল্লাহ কওলি ফিল মারআহ ওয়া মুকারানাতুহু বি আকওয়ালি মুকাল্লিদাতিল গারবি নামক গ্রন্থ লেখেন। এই বইয়ে তিনি বলেন, আমি মনে করি নারীদের শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত তাদের প্রধান ও স্বভাবজাত দায়িত্ব পালন। অর্থাৎ পরিবার পরিচালনা, সন্তান প্রতিপালন ও তাদের চরিত্র গঠন। এবং তাদের শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত পারিবারিক ্যবস্থাপনা, সুস্থতা ও অর্থনীতির ওপর। সব কাজে ও সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের সমান হওয়ার জন্য তাদের শিক্ষা কর্মসূচি হওয়া উচিত নয়। কারণ এটা সম্ভবও না, কল্যাণকরও না। আর নারী-পুরুষের সমতার যেই দাবি, এটা কখনোই সম্ভব নয়। একজন পুরুষের জন্য যেসব বিষয় উপযুক্ত, তার সবগুলো একজন নারীর জন্য উপযুক্ত হবে না। একই কথা বিপরীত ক্ষেত্রেও।

এজন্য নারী-পুরুষের শিক্ষা কর্মসূচি এক হওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো, সমাজের সদস্যদের স্ব স্ব দায়িত্বে দায়িত্ববান করে তোলা। নদের বুনিয়াদি শিক্ষার পর স্ত্রী ও মা হিসেবে একজন নারীর শিক্ষায় প্রথম মগ্রধিকার পাবে এই সংক্রান্ত শিক্ষা অর্জন করা। এজন্য শায়খ মুস্তফা আস সবায় রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, বিশেষভাবে পরিবার পরিচালনা-সংক্রান্ত বিদ্যা মেয়েদের পাঠ্যসূচিতে বেশি পরিমাণ থাকা উচিত। যাতে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সফলতা অর্জন সহজ হয়।

পাশাপাশি মেধা অনুপাতে এবং দীন, উম্মাহ ও সমাজের প্রয়োজনে অর ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন শাস্ত্রেও একজন নারী ব্যুৎপত্তি অর্ডন করতে পারে। নারীর শিক্ষা কর্মসূচি এমন হতে হবে, যা তাকে আদর্শ স্ত্রী ও মা হিসেবে গড়ে তুলবে। তাকে পুরুষের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার বাসনায় উন্মাদ করবে না। তাকে পরিবার থেকে বিমুখ করে বহির্মুখী করে তুলবে না। তাকে এমন কোনো পেশা কিংবা পরিবেশে ঠেলে দেবে না, যেখানে তার নারীত্ব ও মর্যাদা মারাত্মকভাবে শোষিত হয়, কিন্তু সেটা সে অনুভবও করতে পারে না। তাতে মাতৃত্বের পরিচয় ছাপিয়ে কেবলই একটা উৎপাদক যন্ত্র হওয়ার লিপ্সায় অন্ধ করে তুলবে না।

ইসলামে নারীশিক্ষা কর্মসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এই কর্মসূচি প্রথমে তারে আল্লাহর আবদিয়্যাত বাস্তবায়নের চেতনায় উজ্জীবিত করবে। তারপর তাকে একজন আদর্শ পরিবার পরিচালক ও প্রজন্ম তৈরির কারিগর হিসেবে গড়ে তুলবে। সবশেষে তার ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ক্ষেত্রগুলোতে সেবা দেওয়ার জন্য তাকে যোগ্য করে তুলবে।

নারীর চাকরি

নারীর চাকরির কথা বলতে গেলে যেই বিষয়টি বুঝতে হবে, আধুনিক যুগের চাকরি কাঠামো সম্পূর্ণই নতুন। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘরের বাইরে থাকাসহ আরও বিভিন্ন নিয়মনীতি ও বাধ্যবাধকতা পালনের যেই কাঠামো আমরা দেখতে গই সেটার সাথে ইসলামের প্রথম যুগের কিছু দৃষ্টান্ত এনে তুলনা করলে ভুল হয় এবং এটা নিজের ও সমাজের সাথে বিশাল প্রতারণা হবে। তখন হয়তো বিল্যি দলিল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারব, কিন্তু এর খারাপ ফলটাকে অনুধাবন করতে পারব না এবং ইসলামের চাহিদাটাও বাস্তবায়ন করতে পারব না।

ইসলাম কখনোই নারীদের ব্যাপকভাবে ঘরের বাইরে কর্মসংস্থানের দিকে ছোট জন্য উৎসাহিত করে না। আবার নিঃশর্তভাবে তার চাকরির পথকে কড়ও কবে দেয়নি। যেন সে প্রয়োজনের মুহূর্তে এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে। ইসলামের ইতিহাসে ব্যাপকভাবে কর্মের প্রতি নারীদের ঝোঁক পরিলক্ষিত হয় না। মূলত এই ঝোঁক এসেছে পশ্চিমা সমাজ থেকে। কারণ পশ্চিমা সমাজে একটা বয়স পার করার পর পুরুষ নারীর অর্থনৈতিক দায় দায়িত্বের বোঝা বহন করতে চায় না। শায়খ মুস্তফা আস সিবায়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার মতে নারীদের কর্মজীবি হওয়ার মাত্রারিক্ত বাসনা নিছক পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া কিছুই না। এই পথ অবলম্বন করার পর নারীকে সেসব কষ্টকর দায়দায়িত্ব বহন করতেই হবে, যা পাশ্চাত্যের নারীকে করতে হয়। আর এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দর্শনের সকল অনিবার্য কুফলগুলোও তাকে ভোগ করতে প্রস্তুত থাকতে হব্যে

আমরা অনেক সময় হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ব্যবসাকে নারীদের চাকরির পক্ষে দলিল হিসেবে দেখাতে চাই। কিন্তু আমরা ভুলে যাই, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম গ্রহণের আগেও নিজে ব্যবসায় সক্রিয় ছিলেন না। সভ্রান্ত ও ধনী ফ্যামিলির হওয়ায় তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে অঢেল সম্পদ লাভ করেন। সেই সম্পদ গোলাম ও কাজের লোকের মাধ্যমে ব্যবসায় খাটান। এটা ছিল ইসলাম গ্রহণ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বের কথা।

রাসুলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তিনি সকল দায়িত্ব রাসুলের কাছে ন্যস্ত করে দেন। রাসুল দীনের স্বার্থে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সম্পদকে কল্যাণকরভাবে ব্যবহার করেন। আর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার সমস্ত মনোযোগ ও আকর্ষণ রাসুলের প্রতি নিবিষ্ট করেন। হাদিস কিংবা ইতিহাসে এমন কেনো বর্ণনা পাওয়া যাবে না, যার মাধ্যমে বিবাহের পর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যবসায়িক ব্যস্ততা ও আলাপের কোনো চিত্র প্রমাণ করা যাবে। তা ছাড়া যদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যবসার ঘটনা ছিল নবুয়তের পূর্বের ঘটনা। তখনো ইসলামি শরিয়ার বিধান অবতরণ ও তার বাস্তবায়ন শুরু হয়নি। এই ঘটনা শরয়ি বিধানের দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু অনহার দৃষ্টান্ত দিয়ে নারীদের ব্যাপকহারে ব্যবসা বা চাকরির দিকে ধাবিত করার প্রষ্টো ইসলামি শরিয়াহর সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক।হ্যাঁ, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এমন আছে, যা মহিলাদের দ্বারা খুবই উপকৃত হতে পারে। যেমন হাসপাতাল, শিশুবিদ্যালয়, মহিলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ওএ সামাজিক কর্মকাণ্ড যেখানে নারীরাই অধিকতর সফলতা লাভ করতে পারে আবার নারীদের ভেতর এমন কোনো বিরল প্রতিভাধারী মানুষও থাকতে পারে, যাদের মেধা উম্মাহর কল্যাণে বৃহৎ ভূমিকা রাখতে পারে। এসব ক্ষেত্রে নারীর চাকরি করাটা কেবল চাকরিজীবি নারীদেরই প্রয়োজন পূরণ করে মা এর পাশাপাশি তার এই চাকরিটা সামাজিক প্রয়োজন ও দাবি পূরণেও ভূমিক রাখে। এইজন্য উলামায়ে কেরাম এসব ক্ষেত্রে কিছু নারীর অংশগ্রহণরে ফরজে কিফায়া হিসেবে মত প্রদান করেছেন। ফলে আমাদের উচিত নারীবান্ধব এসব ক্ষেত্রকে নারীদের জন্য উন্মুক্ত করা। এগুলো বিশাল এক ক্ষেত্র, যেখানে আমরা নারীদের আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা, যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যকে ব্যাপকভবে কাজে লাগাতে পারি।

নিজেকে প্রমাণ করার জন্য, কথিত স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত তৈরির জন্য, উইমেন এম্পাওয়ারের (নারীর ক্ষমতায়নের) জন্য কিংবা পুরুষের সাথে সমতা প্রতিার জন্য চাকরির প্রতি বর্তমান নারীসমাজের যেই অবাধ ঝোঁক তৈরি হয়েছে, এর সাথে শরিয়াহর কোন সম্পর্ক নেই। উম্মাহর বৃহৎ কল্যাণ ও সত্যিকার অরে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নারী কর্মসংস্থানে আসতে পারে এবা সেটাও ইসলামের অন্য সব বিধিবিধানকে অক্ষুন্ন রেখে। কিন্তু মুসলিম নারীদের প্রধান জায়গা তার পরিবার। পরিবারকে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য দূর্গ হিসেবে প্রস্তুত করার যেই মহান দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষ উভয়কেই দিয়েছেন, সেই দায়িত্ব পালনে পরিবারই তার আসল ক্যারিয়ার, মূল কর্মক্ষেত্র। এখানে অবহেলা ও ত্রুটি করে এবং আল্লাহর শরিয়াহকে লঙ্ঘন করে মুসলিম নারীদের কোনো ক্যারিয়ার থাকতে পারে না। তৈরি হতে পারে না তাদের সফলতা ও উন্নতির কোনো গল্প।

পুরুষের বহুবিবাহ: নারীর স্বার্থহানি নাকি স্বার্থপ্রতিষ্ঠা?

সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের বংশধারা বজায় রাখার একমাত্র পবিত্র ও বৈধ পন্থা হলো বিয়ে। বৈবাহিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে মানুষ তার জৈবিক চাহিদা পূরণের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে। আর এরই ফসল সন্তানাদি। তবে ইসলামে বিয়েকে শুধু নারী-পুরুষের মিলন ও সন্তান জন্মদানের উপায় হিসেবে দেখা হয় না। এই পবিত্র বন্ধনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আরও অনেক ব্যাপক ও গভীর। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহসহ নিজেদের পারস্পরিক সম্প্রীতি- ভালোবাসা, দয়া-মায়া এবং সুখে-শান্তিতে বসবাসও বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

'এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের-যাতে তোমরা প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।”

এই দয়া-মায়া আর ভালোবাসার বিবাহবন্ধনে মানুষ আবদ্ধ হয়। মানুষ চায় না- কেউ তার ভালোবাসায় অংশীদার হোক। অর্থ-সম্পদ ভাগ করে নেওয়া সহজ হলেও ভালোবাসা ভাগ করে নেওয়া কঠিন। ভালোবাসাকে সবাই নিজের মতো করে একাকী উপভোগ করতে চায়। স্বামী চায় তার স্ত্রীকে কেবল নিজের মতো করে পেতে, সত্রীর দিকে কেউ কামনা বা ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকানোকেও সে মেনে নিতে পারে না। আবার সত্রীও চায় সে একাই কেবল তার স্বামীকে পাবে, তার আদর-সোহাগ ও প্রাপ্য ভোগ করবে; কিন্তু এরপরও ইসলাম প্রয়োজনে গুরদরে একাধিক বিয়ে করার অনুমোদন দেয়, নারীকে দেয় না। তখন প্রশ্ন আগে এনে পুরুষকে বহুবিবাহের অনুমতি দিয়ে কি নারীর স্বার্থহানি ঘনিনো হয়নি। স্বাপারে বিস্তারিত আলাপের আগে আমরা ছোট একটি গল্প পড়ে নিই।

'দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে ভাবছি...'

*কিন্তু কেন? আমি কি খুব খারাপ? আমি কি যথেষ্ট ভালো নই? না, না অটি কখনোই দ্বিতীয় বিয়ে মানতে পারি না। অন্যকারও সাথে আপনাকে ভাষাতারি যার নিতে পারি না। আপনি চাইলে আরেকটি বিয়ে করতে পারেন। তবে মনে রাখদে সে ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘর ছেড়ে চলে যাবো।'

এই কথাগুলো বলছেন একজন এমন স্ত্রী, যার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করার ব্যাপার হয় সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলেন। ভোগ বা কোনো ধনী লোকের ষোড়শী দুলালির প্রেমমেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে নয়, বরং বিয়ের মাধ্যমে তার স্বামী একজন এমন অসহায় নারীকে অন্নয় দিতে চাচ্ছিলেন-যিনি সদ্য-তালাকপ্রাপ্তা, চার সন্তানের জননী। ছেলে-মেয়ে নিয়ে যায় খুব কষ্টে দিন কাটছে। তার অবস্থা তখন এতটাই শোচনীয় যে, রাত পোহালে মনে হয়, 'রাতটা আরেকটু দীর্ঘ হলেই ভালো হতো। বাচ্চারা ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলে আয়েল্ট সময় ঘুমিয়ে থাকত। আর রাত হলে মনে হয়, ভোরের আলো ফুটলেই হয়তো ভালে হতো, বাচ্চাগুলোর জন্য দু-মুঠো খাবারের হয়তো ব্যবস্থা করা যেত।'

স্বামীর মুখে সবকিছু শুনেও তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেন? ওদের বাবা কী করে। সে কি বাচ্চাদের দায়িত্ব নিতে পারে না? তাদের দেখাশোনা করতে পারে নাঃ সে নিজেই যদি তার দায়িত্ব পালন না করে, তবে আপনি কেন বাইরের মানুষ হয়ে তায় বোঝা বইতে যাবেন? তাছাড়া আপনি যদি তাকে কেবল সাহায্যই করতে চান, তবে বিয়ে করা ছাড়াও সেটা করতে পারেন। তার আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে পারেন। তার জন্য আবাসন বা কর্মসংস্থান করে দিতে পারেন। সাহায্যের এভগুলো সুযো থাকতেও বিয়েই কেন করতে হবে?'

কারণ, বহুবিবাহ মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা তিনি কল্পনাও করতে পারছিলেন না। তার স্বামীকে আরেকজন নারীর সাথে ভাগাভাগি করবেন, তার অখণ্ড ভালেবা খন্ডিত করে আরেকজন নারী তা উপভোগ করবে; তাকে ছাড়াও তিনি অবেকান নারীকে স্পর্শ করবেন-অসম্ভব! এটা কিছুতেই তিনি কল্পনা করতে পারছিলেন না। দিন গড়িয়ে যাচ্ছিল, স্বামীকে তিনি আর জিততে দেননি। তার অনড় অবস্থান আর হুমকির কারণে তার স্বামী আর সেই বিষয়ে সামনে অগ্রসর হননি। সেই নারী ও তার বাচ্চাদের শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল, তাও জানা যায়নি। তবে এদিকে ঘটেছিল এক আশ্চর্যজনক ঘটনা।

একদিন মাগরিবের সালাতের পরে স্বামী বললেন- 'খুব মাথা ব্যথা করছে, ইশার সালাত পর্যন্ত শুয়ে থাকব।' এ কথা বলেই তিনি শুয়ে পড়েন। কিন্তু হায়! সে-রাতে তার আর ইশার সালাত আদায় করা হয়নি। তার সে ঘুম আর ভাঙেনি। সে-ঘুমেই তিনি মারা যান।

স্বামীর অবর্তমানে সবকিছু দেখভাল করে রাখার সক্ষমতা ছিল না স্ত্রীর। ফলে অযত্নে, অবহেলায় একে একে গাড়ি, দোকান, বাড়ি-সব হারাতে শুরু করলেন। এমনকি তিন সন্তান-সহ তিনি শেষমেষ তার ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। হঠাৎ এতগুলো মানুষের উপস্থিতিতে ভাইয়ের বাড়ি গিজগিজ করতে লাগল। ভাবিও দিনে দিনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন। এভাবে মানুষের দয়ায় কত দিন পড়ে থাকা যায়? নিজেদের জন্য একটি আলাদা বাসার প্রয়োজন খুব

বেশি করে অনুভব করছিলেন তিনি। নারীর জীবনে স্বামী কতটা প্রয়োজন, সেটাও খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করলেন তখন।

হঠাৎ একদিন তার ভাই তাকে ডেকে তার এক কলিগের কথা বললেন। তিনি বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছেন। ভালো মানুষ। চমৎকার আচার-ব্যবহার। দ্বীনদারিও প্রশংসনীয়। তাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করতে চাচ্ছেন। দ্বিতীয়বারের মতো 'দ্বিতীয় স্ত্রী' কথাটি তার কানে এলো; কিন্তু এবারের পরিস্থিতি কত ভিন্ন!

একদিন ভাইয়ের বাসায় তাদের দেখাদেখির ব্যবস্থা হলো। অবিশ্বাস্যভাবে লোকটিকে খুব পছন্দ হয়ে গেল তার। লোকটির প্রতিটি ব্যাপারই খুব ভালো লাগল। কিন্তু পরিস্থিতি হলো সেই আগের মতো, যা তিনি করেছিলেন তার স্বামীর সাথে। লোকটি জানালেন, 'তার প্রথম সস্ত্রী জানেন, তিনি দ্বিতীয় বিয়েতে আগ্রহী। তবে সে এর বিপক্ষে।' তিনি এটাও বললেন, 'দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে একজনকে খুঁজে পেয়েছেন জানলে তার সত্রীর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সেটি তার জানা নেই; তবে তার স্ত্রীর বহুবিবাহ মেনে নেওয়ার ওপরেই এখন তার চূড়ান্ত জবাব নির্ভর করছে।'

'সে-রাতে আমি ইস্তিখারা-সালাত আদায় করলাম। আমি পাগলের মতো চাচ্ছিলাম- যেন বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। আমার মনে পড়ল, আরেকজন নারীর জীবনও ঠিক এরকম করেই আমার সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর করছিল। মনে পড়ে গেল, আমি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। হঠাৎ করে অনুতাপে পুড়ে যাওয়ার মতো একটি উপলব্ধি হলো। বারবার মনে হচ্ছিল, আমি আমার জীবনে আরেকজন নারীকে। আল্লাহ কেন আমাকে আরেকজন নারীর জীবনে স্থান দেবেন। নিশ্চয়ই আ আমাকে শাস্তি দেবেন।

আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকলাম। অবাক লাগছিল। জীবনে এতত আমার মনে হলো না যে, আমি যে-কাজটি করছি তা কতখানি ভুল। আমি সময় ভেবে এসেছি-এমন করাটাই ঠিক ছিল।

কিন্তু এখন যখন আমার অবস্থান পাল্টে গেছে, প্রয়োজন যখন এবার আমার, তার আমি বুঝতে পারলাম, কতটা ভুলে-ই না আমি ছিলাম। আমি আরেকওন নারি স্বামী-পাবার অধিকার অস্বীকার করেছিলাম। আমি দুআ করাতে থাকলাম, দেন যন্ত্র সত্রী আমায় মেনে নেন...।'স

তো, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পুরুষের বহুবিবাহ দেখা যায় এবং তা আইনগভরদে সিদ্ধও বটে। রামায়ণ-মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বহুসংখ্যক স্ত্রী ছিল বলে উল্লেখ হয়ে। সেখানের বিষয়টি

অনেকেরই অজানা। তাই তার বিরুদ্ধে তেমন প্রশ্নও কেউ ভোগে না। না জানা থাকলে প্রশ্ন উঠবেই বা কীভাবে? সামান্য কিছু জানা থাকলে র আলোচিত কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন হবে- এটাই তো স্বাভাবিক।

যাইহোক, বিশ্বমানবতার শান্তির ধর্ম ইসলামও প্রয়োজনে একাধিক বিয়ের স্বীকৃতি বা অনুমোদন দেয়। এ জন্য অনেকেই না জানার কারণে আবার কেউবা তীর্যকভাবে আক্রমণের জন্য প্রশ্ন করে বসেন, নারীকে এমন অনুমতি না দিয়ে কেবল পুরুষকে অনুমতিদান পুরুষকে বিলাসী করা এবং নারীদের অধিকার হরণ করারই নামান্তর। ইসলামের মতো মানবতার ধর্মে তা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হয়?

আমরা যদি ভাসাভাসা চোখে একক বিয়ের গুরুত্বের কথা বলি তবে প্রথমেই করতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম-যা একক বিয়ের কথা বলে। যেমন, আল্লাহ তাআল দেন আর যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, ইয়াতিমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দমতো দুজন, তিন জন কিংবা চার জনকে বিয়ে করো: কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে, তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গাত আচরণ করতে পারবে না, তাহলে মাত্র একটি অথবা তোমাদের অসীন ক্রীতদাসী বিয়ে করো: এটা পক্ষপাতিত্বে জড়িয়ে অবিচার না করার অধিক নিকটবর্তী পদ্ধতি/ম

আপনি যদি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের দিকে লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন-বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, তালমুদ বা বাইবেল যাই হোক না কেন-এগুলোর কোনোটিতেই সন্ত্রীর সংখ্যা নির্ধারিত নেই। যার যতগুলো ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে। পরে সময়ের পরিবর্তনে খ্রিষ্টান পাদ্রী আর হিন্দু পুরোহিতরা একাধিক সত্রী-গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মনে রাখতে হবে এটি পাদ্রী ও পুরোহিতের নিষেধাজ্ঞা, কোনো ধর্মের নয়। পাদ্রীরা করলেই তা ধর্ম হয় না আবার পাদ্রীরা ধর্মীয় আইন না মানলে তা অন্যদের জন্য ধর্ম পালন না করার অনুমোদন হয়ে যায় না। তারা ধর্মীয় কাজের সেবক, ধর্মের প্রণেতা নন।

এক. বহুবিবাহের বিষয়টি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ইসলাম বহুবিবাহ প্রথা এস করেনি। এটা অনেক আগ থেকেই সমাজে চালু ছিল। আরও এগিয়ে বলা যত বহুবিবাহের সর্বোচ্চ কোনো সীমারেখাও ছিল না। তার প্রমাণ আমরা একটু আগেও উল্লেখ করেছি। শুধু ইসলামই বহুবিবাহকে প্রয়োজনে, বাস্তবতার আলোকে মেনে নিয়ে কিছু কঠোর শর্তে সীমাবন্ধ করে দিয়েছে।

দুই. বহুবিবাহ অনুমোদিত, আবশ্যিক নয়।

ইসলাম বহুবিবাহকে অনুমোদন করেছে, তাও শর্তসাপেক্ষে, একে আবশ্যিক বলা হয়নি অর্থাৎ, প্রয়োজনে পুরুষের জন্য এটি বৈধ। আর বৈধ হলেই জরুরি, বিষয়টি তা নয়। যেমন: আমাদের বাংলাদেশীদের জন্য উটের গোশত খাওয়া বৈধ। এর অর্থ কি এই যে, আমাকে উটের গোশত খেতেই হবে, না খেলে গোনাহ হবে? আরও যনিয় উত্তর দেওয়া যেতে পারে। যেমন: যদি কারও টাকা থাকে তিনি পরিবারের লোকদের নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন। এটা অনুমোদিত, তবে আবশ্যিক নয়। অন্যদিকে, দে যদি কারও টাকা চুরি করে জোগাড় করে, তবে এই ভ্রমণ হবে হারাম।

ঠিক তেমনি কারও যদি সামর্থ্য (কী কী সামর্থ্য লাগবে-তা পরে আসছে) থাকে তবে বহুবিবাহ বৈধ; কিন্তু আবশ্যিক নয়। অন্যদিকে সামর্থ্য না থাকলে বস্তুরিবার হারাম। আর এই বহুবিবাহের অনুমোদন যে কতটা গৌণ বিষয়া-তা বুঝতে বেশি দূরে যাবার দরকার নেই। ধরে নিই, আমরা বাংলাদেশের মানুষ। যেখানের ১৯ কোটি মানুষের প্রায় ৯০ ভাগ লোক মুসলমান। মানে, মোটামুটি ১৪ কোটি ৪০ লাখ। আচ্ছা, আমরা কয়টি মুসলিম পরিবার দেখেছি-যাদের কারও ৪ জন স্ত্রী আছে। সম্ভবত আপনি বলবেন, একটিও দেখিনি। এবার খুঁজি কয়জনের পরিবারে একসাথে ৩ জন স্ত্রী আছে। হয়তো উত্তর একই হবে। যদি জিজ্ঞেস করি ২ জন স্ত্রী একসাথে আছে এমন পরিবার কয়টি পেয়েছেন? আপনি এবার হয়তো কাউকে পেতে পারেন।

উইলিয়াম কেলি রাইট যথার্থই বলেছেন,

'In fact most Mohammadans in all ages have had only one wife

অর্থাৎ, সর্বযুগে অধিকাংশ মুসলিম শুধু একটি বিবাহ করে এসেছে। সুতরাং, বিষয়টি স্পষ্ট যে, বহুবিবাহ প্রয়োজনে বৈধ, জরুরি কিছু নয়।১৯)

তিন. ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি।

ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন: বর্তমানে আমেরিকায় নারী-পুরুষের সংখ্যার অনুপাত হলো ১০০: ১৭.০২, যুক্তরাজ্যে ১০০: ৯৭.১৮, জার্মানিতে ১০০: ৮৯.৯২, রাশিয়ায় ১০০: ৮৬.৮০৪৯ এবার একটু সংখ্যা দেখি, যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষের চেয়ে ৭.৮ মিলিয়ন নারী বেশি, শুধু নিউইয়র্কে ১ মিলিয়ন নারী বেশি। আর এখানের পুরুষদের এক-তৃতীয়াংশ হলো সমকামী। পুরো যুক্তরাষ্ট্রে ২৫ মিলিয়ন (২৫০ লক্ষ বা ২.৫ কোটি) পুরুষ সমকামী (Gays)। তারা তো আর নারীদের বিয়ে করবে না। গ্রেট বৃটেনে

পুরুষের তুলনায় নারী ৪ মিলিয়নের অধিক। জার্মানে ৫ মিলিয়ন নারী বেশি আর রাশিয়াতে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৯ মিলিয়নের অধিক

একক বিয়ের বক্তব্য অনুসারে যদি একজন পুরুষ মাত্র একজন নারীকে বিয়ে করে তবে অতিরিক্ত মেয়েদের সামনে এই পথগুলো খোলা থাকবে

- সারা জীবন অবিবাহিত থাকা;
- সেই পুরষের সত্রী হওয়া-যার পূর্বে স্ত্রী আছে
- পতিতাবৃত্তি;
- সমকাম;
- অন্য কোনো নিকৃষ্ট পন্থায় জৈবিক চাহিদা পূরণ।

যদি সে এমন পুরুষের স্ত্রী না হয়-যার পূর্বে স্ত্রী আছে তবে এই অতিরিক্ত নারীর একজন গর্বিত স্ত্রী ও শ্রদ্ধেয় মা হতে পারবে না এবং বৈধ পন্থায় তার জৈবিক চারদ মেটাতে ব্যর্থ হবে। বৈধভাবে চাহিদা মেটাতে না পারলে সেটা অবৈধ ভাবে মেটাতে উদ্যোগী হবে। কারণ, এটিও এক প্রকারের ক্ষুধা। যা নিবারণ করা জরুরি। যখনই সে অবৈধ পথে হাঁটবে তখনই সে তার নিজের এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর হবে। সে সাময়িক সময়ের জন্য আনন্দ পেলেও তার ভবিষ্যৎ থাকবে অনিশ্চিত। কেউ তার দায়িত্ব নেবে না। দুর্দিনে সে পাবে না কোনো ছায়া।

আর সমাজ তার মাধ্যমে হবে কলুষিত। সে অন্যের ঘর ভাঙার কারণ হবে। আরেকজনে সুখ-সংসার নিয়ে তখন সে মোটেও ভাববে না। ভাববেই বা কীভাবে। অন্যজন স্বামী সন্তান-পরিবার নিয়ে সুখে থাকবে আর সে তা চেয়ে চেয়ে দেখবে-তা হতে পারেনা অধিকার-বঞ্চিত মানুষ সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই তো আন্ডার ওয়ার্ল্ডের লিডার হয়। এ নারীও তার স্বামী-সন্তান-পরিবার অধিকার-বঞ্চিত হয়েই অন্যের স্বামীর দিকে হাত বাড়াবে। আর এভাবেই ভেঙে যাবে আরেক মেয়ের সোনার সংসার।

কোনো মেয়ের জন্য গণিকা হওয়া ভালো নাকি অন্যের দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে তার নিজের সকল চাহিদা পূরণ করা ভালো। সচেতন, সুস্থ মস্তিষ্কের যে কেউ বলবেন- অন্যের দ্বিতীয় স্ত্রী হবার কথা। এ্যানি বেসান্ত বলেছেন-

Monogamy with a blended mass of prostitution was hypocr and more degrading than a limited polygamy. অর্থাৎ, ব্যাপক বেশ্যাবৃত্তির সাথে মিশ্রিত একক বিবাহ হলো ভন্ডামি এবং সীমিত বহুবিবাহের চেয়ে বেশি অবমাননাকর

আর এ জন্যই ইসলাম এই অনুমোদন রেখেছে। জানি, কোনো মেয়েই খুশি হবে না তার সতীনের ঘর করতে; কিন্তু নারীজাতির বৃহৎ স্বার্থে তাকে এটা মানতেই হবে। তারণ, বলা তো যায় না, কে স্বামীহারা হয়। আজ যার স্বামী আছে আর সে এতে অন্যকে ভাগ দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে হয়তো কাল সে-ই হবে স্বামীহীনা। যেমনটি আমরা ওপরের গল্পে দেখছি; একজন নারী-যিনি আরেকজনকে সহ্য করেননি; কিন্তু একসময় তাকেই অন্যের করুণাপ্রার্থী হতে হয়েছে।

ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে কারও মনে এই প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, কই, ভারতে তো পুরুষের সংখ্যা বেশি। তো তাদের জন্য একটি তথ্য উল্লেখ করতে চাই। তা হলো, বিবিসির একটি প্রোগ্রাম 'Let Her Die'-এ একজন ব্রিটিশ রিপোর্টার ভারতে আসেন। তিনি একটি রিপোর্ট করে বলেন, ভারতে গড়ে প্রতি বছরে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) ভূণ হত্যা করা হয় যখন জানা যায় যে পেটের এই শিশুটি নারী ভূণ। রাজস্থানের বিলবোর্ডে লাগানো হয়েছে, ৫০০ রুপি খরচ করেন (গর্ভপাত করার জন্য) আর বাঁচান ৫ লক্ষ রুপি (যা মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেওয়া লাগবে) (ণ সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে ভারতের স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, উত্তরাখন্ড রাজ্যের উত্তরকাশী জেলার ১৩৩টি গ্রামে গত তিনমাসে জন্মানো ২১৬ শিশুর সবক'টিই ছেলে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই জেলার দুন্ডা ব্লকে ২৭টি গ্রামে গত তিন মাসে জন্ম নেয়া ৫১ শিশুর সবাই ছেলে। একই চিত্র উঠে আসে জেলার ভাটওয়ারি ও নওগা ব্লকের গ্রামগুলো থেকেও। ধারণা করা হচ্ছে এর প্রধান কারণ নারী ভ্রুণ হত্যা।

এখনো বাংলাদেশে ছেলেদের সংখ্যা বেশি আছে। তবে ধীরে ধীরে নারীদের সংখ্যা বাড়ছে। পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে ১৯৬০ সালে নারী-পুরুষের অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১০০: ১০৬.৯৭, ২০০০ সালে ১০০: ১০৪.২০ এবং সর্বশেষ ২০১৫ সালে ১০০: ১০১.৮৬। অর্থাৎ, নারীর সংখ্যা দ্রুত ক্রমবর্ধমান। ইসলাম এমন একবিধান আরোপ করে-যা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। কোনো একসময়ের বা স্থানের জন্য তার মৌলিক বিধানের কখনোই পরিবর্তন হবে না।

চার, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের গড় আয়ু বেশি

স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ছেলে-মেয়ে প্রায় একই অনুপাতে জন্মগ্রহণ করে। তরে পুরুষের চেয়ে নারীদের গড় আয়ু বেশি। তারা বেশিদিন বাঁচে। সেন্টার ফর হেলথ (Centre For Health)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকায় নারীদের গড় হয় ৭৭.৯ বছর আর পুরুষের গড় আয়ু ৭০.৩ বছর। বর্তমান বাংলাদেশের মানুষের গয় আয়ু ৭১ বছর ৬ মাস। এর মধ্যে পুরুষের গড় বয়স ৭০ বছর ৩ মাস অন্যদিকে নারীদের গড় আয়ু দাঁড়িয়েছে ৭২ বছর ৯ মাস (১৯

শিশু বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, একজন ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকে। আর তাই শিশু মৃত্যুর হার মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশি। একটি সদ্যজাত ছেলে শিশুর জন্মের আগেই তার জমজ বোনের তুলনায় ২৫% বেদি মৃত্যু ঝুঁকিতে থাকে। শিশুমৃত্যুর সিনড্রোমে মেয়ে শিশুর চেয়ে একটি ছেলে শিশুর মৃত্যুর সম্ভবনা ৫০% বেশি। আবার যুদ্ধের সময়, মদ্যপানে, রোড এক্সিডেন্টে, কঠিন কর্মক্ষেত্রে যেমন বিল্ডিং নির্মাণে ছেলেরা বেশি মারা যায়।

যেমন ধরুন, ১০০ টি শিশুর জন্ম হলো যার ৫০ টি ছেলে এবং ৫০ টি মেয়ে। এখন থেকে ৩ টি ছেলে ও ২ জন মেয়ে জন্মের সময় মারা গেল, রোড এক্সিডেন্টে মারা গেল ২ জন ছেলে ও ১ জন মেয়ে, কর্মক্ষেত্রে ২ জন ছেলে ও ১ জন মেয়ে আর যুদ্ধের সম্য মারা গেল আরও ৩ জন ছেলে ও ১ জন মেয়ে। সর্বসাকুল্যে ছেলে রইল ৪০ জন আর ৪৫ জন মেয়ে। এখন যদি ৪০ জন ছেলের সাথে ৪০ জন মেয়ের বিয়ে হয় তবে বাড়ি ৫ জন মেয়ের কী হবে? রোহিঙ্গাদের বিষয়টি এখানে সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এখনে অধিকাংশ পুরুষকে হত্যা করা হলেও নারীদের তেমন হত্যা করা হয়নি। এখন পুরুষেরা যদি কেবল তাদের সমসংখ্যক নারীদের বিয়ে করে তবে বাকি নারীদের কী হবে?কখনো কখনো যুদ্ধ বা অন্যান্য কারণে যে, পুরুষের বহুবিবাহ জরুরি হয়ে পড়ে তা ইংরেজ দার্শনিক ও নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক জর্জ বার্নার্ডশ অকপটে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন-

"If in consequence of a Great War three quarters of the men in this country were killed, it would be absolutely necessary to adopt the Mohammedan allowance of four wives to each man in order to recruit the population

অর্থাৎ, যদি কোনো বড় যুদ্ধের ফলে এই দেশের তিন-চতুর্থাংশ লোক নিহত হয়, তবে জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষার জন্য মুসলিমদের বিধান চার বিবাহের অনুমোদন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

এভাবেই গড়ে মেয়েদের জীবনহার ছেলেদের চেয়ে বেশি হয় এবং একটি নির্দিষ্ট ও প্রদত্ত সময়ে বিপত্নীকের চেয়ে বিধবার হার বেড়ে যায়। এই বিধবার কি অধিকার নেই স্বামী পাবার? যাদের স্বামী আছে তারাই কি কেবল স্বামীর আদর ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার রাখে? সুতরাং, বাস্তবতার আলোকে ইসলাম সীমিত পরিসরে একাধিক বিয়ের অনুমোদন দিয়েছে।
পাঁচ. মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের যৌন ক্ষমতা অনেক বেশি।

১৮ বছরের পর থেকেই মেয়েদের যৌন চাহিদা কমতে থাকে, ৩০-এর পরে ভালোই কমে যায়। ২৫ এর উর্ধ্বে মেয়েরা স্বামীর প্রয়োজনে যৌনকর্ম করে ঠিকই; কিন্তু একজন মেয়ে মাসের পর মাস কোনো সমস্যা ছাড়াই যৌনকর্ম না করে থাকতে পারে।**১২১**

আর ৪০-৪৫ বছর পরে নারীদের যৌন ইচ্ছা প্রায় শেষ হয়ে আসে। নারীদের এ ইচ্ছে একবার কমতে শুরু করলে তা আর বাড়ে না। অন্যদিকে পুরুষের যৌন ইচ্ছা মোটামুটি আজীবন থাকে। বয়সের সাথে সাথে তা কমে যায় তবে নিঃশেষ হয় না। এ জন্য অনেক সময় বৃদ্ধ পুরুষদের মেয়েদের সাথে দুষ্টুমি করতে দেখা যায়। এখন কোনো পুরুষের জন্য যদি আরেকটি বিয়ে করার অনুমোদন না থাকে তবে সে পাপকাজে লিপ্ত হতে পারে--যা সমাজে এক ভয়ানক প্রভাব ফেলতে

ছয়. আমরা জানি, প্রতি মাসে মেয়েদের নির্দিষ্ট কিছুদিন ঋতুস্রাব হয় (যা ৩ দিনথেকে ১০ দিন পর্যন্তও হতে পারে। আবার সন্তান গর্ভে ধারণের শুরু ও শেষের দিকে কয়েকমাস সামী-সন্ত্রীর মিলন গর্ভের সন্তান ও তার মায়ের জন্য স্বাস্থ্যগত ঝুকিপূর্ণ এবং জন্মদানের পর দীর্য একটি সময় নেফাস চলে। এ সময়ে স্বামী-স্ত্রী মিলন সম্ভব না স্বাস্থ্যগত ক্ষতিকরও বাটে। এখন স্বামী যদি অধিক যৌন ক্ষমতাসম্পন্ন হয় এবং তার দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন না থাকলে তখন তার দ্বারা অনৈতিক কাজ হতে পারে। ভেঙে যেতে পারে তিলে তিলে গড়া সোনার সংসার।

আবার পুরুষের যৌন চাহিদা যেহেতু নারীর চেয়ে চারগুণ বেশি। এখন এই এক স্ত্রী যদি স্বামীকে সন্তুষ্ট না করতে পারে তবে স্বামী হতে পারে বিপথগামী। এটা স্ত্রীর জন্য মেনে নেওয়াও সম্ভব হবে না। ব্যাভিচার এবং বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কে শুধু আল্লাহর আইনেরই লংঘন নয়, বরং তা সমাজকেও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়।

সাত, ধরেন, বিশেষ একজন সুখী যুবক যার স্ত্রী এবং দুই সন্তান হয়ে আকস্মিকভাবে তার স্ত্রী মারাত্মক অসুখে পড়লেন (মানসিক অথবা দৈহিক) অথব এমন দুর্ঘটনার শিকার হলেন যে স্বামীর সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সামর্থ্য নেই। এ অবস্থায় ওই যুবকের সামনে যে-কয়েকটি পথ খোলা থাকে তা নিম্নকূল।

[ক] বাকি জীবনের জন্য সে তার জৈবিক কামনাকে দমন করে রাখতে পারে-এ অনেকের পক্ষেই অসম্ভব।

[খ] সে তার স্ত্রীকে রেখে বিয়ে-বহির্ভূত যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারেনা অনৈতিক, অসামাজিক।

[গ] সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করতে পারে--যা অমানবিক।

[খ] সে অন্য একজন নারীকে বিয়ে করতে পারে, যে তার প্রথম স্ত্রী এবং তার ছেলেমেয়ের সেবা করতে পারে। বস্তুত, এটাই একমাত্র সমাধান যা নৈতিকতা, মানবিকতা ও প্রবৃত্তি-এই তিন বিষয়ে সাম্য রক্ষা করে।

কারও প্রশ্ন হতে পারে, স্বামীও তো মারাত্মক অসুখে পড়তে পারে (মানসিক অথবা দৈহিক) অথবা এমন দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে যে স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সামর্থ্য আর থাকল না। তখন কী হবে?

এ ব্যাপারে বন্ধ্যা বা রুগ্ন নারীর স্বামীর যা যা সুযোগ আছে তার সবই নারীর আছে, শুধু বহুবিবাহের সুযোগ নেই। তার অবস্থাগুলো হচ্ছে-

[ক] সে ধৈর্যের সাথে রুগ্ন স্বামীর সেবা করেই ঘর করতে পারে। অথবা-

[খ] রুগ্ন স্বামীকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করতে পারে (এ ক্ষেত্রে নারীর তালাকের পূর্ণ অধিকার আছে)। তালাক সাথে সাথেই দেবে না; বরং চিকিৎসা করে সুস্থ করার চেষ্টা করবে এবং যদি চিকিৎসায় আর সুস্থ হতে না পারে তবেই তালাক দিতে পারে।

আট. ইসলাম ঢালাওভাবে বহুবিবাহের অনুমোদন দেয় না

ইসলাম ঢালাওভাবে বহুবিবাহের অনুমোদন দেয় না; বরং তার জন্য কিছু শর্ত ইসলাম আরোপ করেছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন-যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না তাহলে।

অর্থাৎ, একজন পুরুষ ইচ্ছে করলেই একাধিক বিয়ে করতে পারে না, তাকে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। আর এ শর্তগুলো প্রধানত নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সাথেই সম্পৃক্ত। কারণ, এ ব্যবস্থা থেকে বেলাশেষে নারীরাই বেশি উপকৃত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একজন

পুরুষ একসাথে চার জনের বেশি স্ত্রী রাখতে পারবে না; কিন্তু তার ওপর প্রথম সত্রীর মতোই সকল স্ত্রীর, সকল প্রকারের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব আদায় করা আবশ্যক। আর সেই শর্তগুলো হলো-

- তাকে সকল স্ত্রীর ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য থাকতে হবে।
- স্ত্রীদের যৌনচাহিদা পূরণে সক্ষমতা থাকতে হবে।
- সকলের মাঝে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে হবে।
- কাউকে অধিকারের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।

অর্থাৎ, কোনো একজন স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়ে অন্যদের থেকে অমনোযোগী হওয়া যাবে না। বরং সকল স্ত্রীকে সবকিছু সমমানের জিনিস দিতে হবে। যেমন: সমমানের খাদ্য-পোশাক প্রদান। তবে অবস্থাভেদে পরিমাপ কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। যেমন, কোনো স্ত্রী লম্বা হওয়ায় তার ৫ গজ কাপড় লাগে আর কেউ খাটো হওয়ায় ৪ গজ লাগে। এতে সমস্যা নেই। তবে মূল্যমান সমপর্যায়ের হতে হবে। তেমনি তাদের বাসস্থানও হবে সমমানের। কেউ টিনের ঘরে আবার কেউ বিল্ডিঙে যেন না হয়।

তাদের সমপরিমাণ সময় দিতে হবে। যেমন, একেক জনকে এক রাত বা দুই রাত করে। তবে একজনকে ভালো লাগে বলে তাকে দুই রাত, আরেকজনকে ভালো লাগে না বলে একরাত দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে নববধূকে প্রথমে ৩/৭ দিন সময় দিতে পারবে। এ সকল বিষয় যদি কেউ পূরণ করতে না পারে তবে তার জন্য একাধিক বিয়ে করা জায়েজ হবে না। আর পূরণ করতে পারা বা না পারার আশঙ্কা থাকলে একটি বিয়েই করাই উচিত যেমনটি কুরআনে কারিমে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ড. আবু আমিনা বিলাল ফিলিপসের দুই-তিন-চার-এক বইটি পড়তে পারেন।

এরপরও যারা একক বিবাহের কথা বলবেন, তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন:

■ বহুবিবাহকে যারা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে তারা কি সুযোগ-সন্ধানীদের নিবৃত্ত করতে পেরেছেন?

■ তারা কি তাদের সমাজে বিশুদ্ধ একক বিবাহ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। ■ আচরণ ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় স্ত্রীর চেয়ে এসব সমাজের নারী কি অধিক মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন করছে।

আসলে পশ্চিমাবিশ্ব বা তাদের অন্ধ অনুসারীরা একক বিবাহের যে ধুয়া তোলেন তার বাস্তবতা বড়ই ভয়ঙ্কর। তারা একক বিবাহের কথা বললেও তাদের অধিকাংশই বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরেও অনেকের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে। একই সাথে একাধিক সস্ত্রী রাখার অনুমতি না থাকায় একজনকে ছেড়ে দিয়ে অন্যজনকে বিয়ে করার ঘটনা বর্তমানে বেড়েই চলছে। এটাই পশ্চিমাবিশ্বের বহুবিবাহের নিকৃষ্ট বিকল্প পদ্ধতি।

অন্যদিকে সমসংখ্যক পুরুষ না থাকায় নারীরা তাদের শারীরিক চাহিদা মেটাতে প্রেমিকা, উপপত্নী বা বিছানার সঙ্গী হতে বাধ্য হচ্ছেন; কিন্তু এটা তাদের সাময়িক শান্তি প্রদান করলেও বিধি-বন্ধনহীন এ অনিশ্চিত সম্পর্কের কারণে তাদের মানসিক প্রশান্তি সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। ফলে সেখানে আত্মহত্যার পরিমাণ অনেক বেশি। নিউইয়র্ক টাইমসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে আত্মহত্যার পরিমাণ ছিল ২৯,১৯৯ জন। ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২,৭৭৩ জন। দুনিয়ার কোন সম্পদের অভাব তাদের এই পথে যেতে বাধ্য করল? মানসিক প্রশান্তির অভাবে তারা এই জীবনকে বোঝা মনে করছে।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, পুরুষের বহুবিবাহ করা বৈধ বিষয়টি বোঝা গেল; কিন্তু নারীকে কেন বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হলো না?

ইসলামি সমাজের রীতি-নীতি হলো সমতা ও ইনসাফভিত্তিক। আল্লাহ তাআলা নারী এবং পুরুষকে ভিন্ন ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। নারী-পুরুষ তাদের শারীরিক কাঠামো এবং মানসিক দিক দিয়ে ভিন্ন। সুতরাং, তাদের সকল বিষয় যে একই রকম হবে-তা নয়। বহুবিবাহের এই বিষয়টিও একটি ভিন্ন ব্যাপার। অর্থাৎ, পুরুষের বহুবিবাহ বৈধ হলেও নারীকে বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়নি। আল্লাহ বলেন- অর্থাৎ, যে-নারী একজনের সস্ত্রী হিসেবে আছে তাকে অন্য পুরুষ বিয়ে করাতে পারবে না আর ওই নারীও অন্য পুরুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবন্ধ হতে সারার না। আর তাদের বহুবিবাহের অনুমতি না দেওয়ার বেশকিছু কারণ রয়েছে।যেমন

[১] একজন পুরুষ যদি একাধিক বিয়ে করে তাহলে সহজেই তার সন্তানের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থ্যাৎ, আলাদাভাবে সেই সন্তানের পিতা-মাতা সনাস্ত করা সম্বৎ কিন্তু একজন নারী যদি একাধিক বিয়ে করে তাহলে সন্তানের পিতার পরিচয় নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হবে, বংশধারায়

তালগোল লেগে যাবে, পরিবারগুলো ভেঙে পড়তে শিশুরা বাস্তুহারা হবে এবং নারী তার সন্তানাদি লালনপালন ও ভরণপোষণের ভার বইতে না পেরে ভেঙে পড়বে। এভাবে একপর্যায়ে নারীরা স্থায়ী বলারও গ্রহণ করতে পারে। যার ফলে মানববংশ বিলীন হয়ে যাবে। ইসলামে মাতা-পিতা উভয়ের সনাক্তকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করে।

সমস্যার বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক-

একজন সামর্থ্যবান কৃষক। তার জন্য একাধিক জমি চাষাবাদ করা কণ্টকর হলেও সম্ভব। তিনি চাইলেই করতে পারেন। নিজের শান্তি ও সুতিময় জীবনযাপনের জন্য জন্য পর্যাপ্ত ফসল প্রয়োজন। সকল জমি থেকে সুন্দরভাবে ফসল পেতে চাইলে সব জমির প্রতি সমান যত্ন নিতে হবে। যদিও এটি কষ্টসাধ্য। তাই সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও একজন কৃষক পরিমিত জমিতেই পরিকল্পনা করে বছরব্যাপী চাষাবাদের আয়েজন করে। পরিমিত জমিতে সমপরিমাণ শ্রম দেওয়া যায়; কিন্তু অপরিমিত হলে তা একজনের দ্বারা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে এক জমিতে একাধিক কৃষক মিলে বিভিন্ন ধরনের বীজ কখনোই বর্ণন করে না। যদি সেটা করা হয় তাহলে সব ফসলই নষ্ট হবে। কারণ, একটি পাত্রে ভিন্নধর্মী একাধিক জিনিস যেমন পেশাব ও দুধ রাখা অসম্ভব। ঠিক একইভাবে একই নারীতে একই সাথে একাধিক পুরুষের সন্তান হওয়াও অসম্ভব। জমিতে যেমন ফজল জন্মের মাধ্যমে মানুষের মুখে হাসি ফোটে তেমনি নারীর জমিতুল্য উদরে জন্ম হয় পবিত্র প্রজন্ম। কুরআনে কারিমে এ জন্যই নারীদের তুলনা করা হয়েছে ফসলী জমির সাথে। যেখানে চাষাবাদের মতো একই পদ্ধতিতে মানববীজ বপন করতে হয়। আর তাতে উৎপন্ন হয় পবিত্র ফসল। সুতরাং, একে কলুষিত করা যাবে না।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, যে-সন্তান তার মাতা-পিতা এবং বিশেষত পিতার পরিচয় জানে না তারা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই সন্তানের তার পিতার নামের প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে সেই সন্তানের পিতার নাম কি একাধিক হবে? যদিও আমরা জানি, বর্তমানে বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে এবং এর মাধ্যমে আজ পিতা-মাতা শনাক্তকরণ সম্ভব। সেক্ষেত্রে হয়তো বিষয়টি বর্তমানের জন্য প্রযোজ্য নয় বলে কেউ ভাবতে পারে; কিন্তু এই প্রযুক্তি তো সেদিনের। কিছুদিন আগেও এটা সনাক্ত করা সম্ভব ছিল না।

আর এটা তো সকলেরই জানা যে, এভাবে সনাক্ত করতে চাইলে বহু ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়। আবার ডাক্তাররাও অনেক সময় ভুল করে থাকে। তখন তো একজনের সন্তান হয়ে যাবে অন্যের। ইসলাম তো সব সময়ের, সকল সমস্যার সমাধান দেওয়ার ধর্ম। কোনো এককালে

এটা সমাধান দেবে আরেক যুগে হয়ে যাবে অচল-এমন জিনিস ইসলামে নেই। এ এক শাশ্বত জীবনব্যবস্থা।

[২] আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সাব্যস্ত হয়েছে, এইডসের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিগুলোর প্রধান কারণ হচ্ছে, কোনো নারীর একাধিক পুরুষের সাথে মিলিত হওয়া। নারীর গর্ভাশয়ে বহু রকমের বীর্য একত্রিত হওয়ার ফলে এ ধরনের দূরারোগ্য অসুখের বিস্তার ঘটে। এ কারণেই তো আল্লাহ তাআলা তালাকপ্রাপ্ত নারী বা যে-নারীর স্বামী মারা গিয়েছে তার ওপর ইদ্দত পালন করা ফরজ করেছেন। যাতে করে কিছুকাল এভাবে (সঙ্গমহীন) থাকার মাধ্যমে তার গর্ভাশয় ও এর আশপাশের স্থানগুলো আগের স্বামীর বীর্য ও সঙ্গমের আলামত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকার ক্ষেত্রে এই সমস্যার উদ্ভব হয় না।

[৩] প্রকৃতিগতভাবেই বহুবিবাহের ক্ষেত্রে নারীদের চেয়ে পুরুষেরা বহুগামী।

[৪] পৃথিবীতে মানুষ আগমনের শুরু থেকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ছিল। এখন আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে দু-একটি উপজাতির কথা ব্যতিক্রম পুরুষপ্রধান সমাজে কোনো পুরুষের জন্য এটা অপমানজনক যে, তার স্ত্রীর কাছে অন্য পুরুষ গমন করবে। স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায়, কোনো স্বামী যদি অন্য নারীর সঙ্গলাভ করে তবে সে অনুতপ্ত হলে স্ত্রী সেটা কষ্ট হলেও মেনে নিতে পারে; কিন্তু সত্রী যদি অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গলাভ করে তবে স্বামী কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। কারণ, এটা তাঁর রুচি এবং মর্যাদার বিষয়।

[৫] যদি নারীর একাধিক স্বামী থাকে তবে দেখা যাবে, একই সময়ে তাকে একাধিক পুরুষের প্রয়োজন পূরণ করতে হতে পারে। আলাদা আলাদা পুরুষের প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে একজন নারী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হতে পারে। । শারীরিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ নারীর চেয়ে পুরুষের বেশি।

[৬] জীবতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন পুরুষের পক্ষে একাধিক দায় দায়িত্ব পালন করা সহজ। একজন নারীর পক্ষে একাধিক স্বামীর প্রতি অনুরূপ দায়িত্ব পালন করা সহজ নয়।

[৭] মেয়েদের যৌন চাহিদা ছেলেদের ৪ ভাগের এক ভাগ। ৪ ভাগের একভাগ ইচ্ছে থাকা কোনো মেয়েকে আরও বেশিসংখ্যক পুরুষের সান্নিধ্যে পাঠানো তাকে অধিকার দেওয়া নাকি তার ওপর অত্যাচার? যেমনটি করা হয় পতিতালেয়র মেয়েদের সাথে। এগুলো কোনো মেয়ে স্বেচ্ছায় করে না; করে বিভিন্ন কারণে।

নারীবাদীদের থেকে মুক্তি পেতে আমাদের করণীয়

মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিকরা ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আসছে। আমাদেরকে তাদের মতো কাফের বানানোর জন্য তাদের এই শত্রুতা কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। এটি আল্লাহর কুরআনের সুস্পষ্ট বাণী। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.

ইহুদি ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশি হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। বলে দাও, প্রকৃত হিদায়াত তো আল্লাহরই হিদায়াত। তোমার কাছে (ওহির মাধ্যমে) যে জ্ঞান এসেছে, তারপরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো, তবে আল্লাহর থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না।'

আমরা যদি আধুনিক ইতিহাসের প্রতি লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব, কীভাবে পশ্চিমা বিশ্ব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিধি-নিয়মের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। এগুলো কোন ষড়যন্ত্রতত্ত্ব নয়; বরং ওপেন সিক্রেট। স্বয়ং পশ্চিমারাও এই বিষয়গুলে অস্বীকার করবে না।
মুসলিমদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করা নতুন কিছু নয়; বরং পবিত্র কুরআনেও আমরা এর উপস্থিতি দেখতে পাই। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ.

*(তারপরের বৃত্তান্ত এই যে) নগরের বিলকুল দূর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসল ও বলল, হে মুসা! নেতৃবর্গ তোমাকে হত্যা করার জন্য পরামর্শ করছে। সুতরাং তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। বিশ্বাস করো, আমি তোমার কল্যাণকামীদের একজন।'

কিন্তু বর্তমান সময়ে সেকুলার, লিবারেল ও মডার্নিস্টদের অনেকে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে উপহাসের অবস্থান গ্রহণ করেছে। তারা এই বলে তিরস্কার করে যে, মুসলিমরা সবকিছুতেই ষড়যন্ত্র খোঁজে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কিছু লোক ষড়যন্ত্র নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করে। কিন্তু

ষড়যন্ত্রের বিষয়টিকে একেবারেই নাকা করে দেওয়া বাস্তবতাকে অস্বীকার করা ছাড়া কিছুই না। যারা ষড়যন্ত্রকে অস্বীকর করে, দেখা যাবে তাদের অধিকাংশই হয়তো পশ্চিমাদের এজেন্ট ও তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী কিংবা তারা পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি মুগ্ধ ও অনুরাগী। ব্যতিক্রম কিছু ছাড়া সবাইকে আপনি এই ক্যাটাগরিতে খুঁজে পাবেন।

ষড়যন্ত্রতত্ত্ব নিয়ে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্য হলো, সাধারণভাবে ষড়যন্ত্রকে অস্বীকার করা ষড়যন্ত্রের অংশ। আর ষড়যন্ত্র নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হলো যড়যন্ত্রে সহায়তা করা। এজন্য যারা ষড়যন্ত্রতত্ত্ব দিয়ে মুসলিমদের নিয়ে উপহাস করে তাদের অধিকাংশ নিজেরাই এই ষড়যন্ত্রের অংশ (জেনে কিংবা না জেনে, বুদে কিংবা না বুঝে)। আর র‍্যান্ড কর্পোরেশনের রিপোর্টগুলো থেকে এই বাস্তবত আরও সুস্পষ্ট হয়ে যায় আমাদের সামনে। আর যারা ষড়যন্ত্র নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে শত্রুদের ব্যাপারে মুমিনদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে এবং সেই ষড়যন্ত্রগুলোকে অজেয় ও অধরা বানিয়ে মুসলিমদের সামনে উপস্থাপন করে, তারা হলো ষড়যন্ত্রের সহায়তাকারী (বুঝে কিংবা না বুঝে)।

আমরা বিশ্বাস করি কাফেররা প্রতিনিয়ত আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ হলেন সেসব চক্রান্তের উত্তম প্রত্যুত্তরদাতা। ফলে তাদের যড়যন্ত্র হলো মাকড়সার জালের মতো দুর্বল। আমাদের দায়িত্ব হলো, সচেতনতার সাথে সেগুলোর মোকাবিলা করে যাওয়া। আল্লাহ তাআলাই তাদের সকল পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দেবেন।
সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এখানে মুসলিম-সমাজ, বিশেষত মুসলিম নারীদের জন্য করণীয় কিছু বিষয় তুলে ধরব-

১. বিকৃত নারীবাদী আন্দোলন ও ইসলামি শরিয়াহবিরোধী নারী-অধিকারের দাবি উত্তোলনকারী প্রত্যেক প্রচেষ্টা, স্লোগান ও সংস্থার বিরুদ্ধে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করা।

২. কর্মের প্রতি মুখাপেক্ষী নারীদের জন্য শরিয়াহবান্ধব পরিবেশ ও সেক্টরের ব্যবস্থা এবং তার দাবিকে জোরদার করা। পাশাপাশি এমন বোনদের বৈধ সেক্টরগুলোর প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং ইসলামি শরিয়াহ কর্তৃক নিষিদ্ধ সেক্টরগুলো থেকে বিমুখ করে তোলা।

৩. নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অনলাইন ও অফলাইনভিত্তিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা এবং এই ক্ষেত্রে দুটি পর্যায়ে কাজ করা। প্রথমত, ইসলামি শরিয়াহর প্রতি নারীর সম্মান ও গর্বকে ইতিবাচকভাবে বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়ত, নারীবিষয়ক সেকুলার, লিবারেল ও ফেমিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর অসারতা ও ভ্রান্তিকে সুস্পষ্ট করা।

৪. মুসলিম নারীদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু বোনদের তৎপর হওয়া উচিত, যারা আদর্শ ও ইলমি যোগ্যতায় উত্তীর্ণ। এ সমস্ত বোনরা মুসলিম তরুণীদের মাঝে ইসলামি শরিয়াহর বিধানগুলো আপসহীনভাবে হৃদয়ঙ্গম করে বোনদের সামনে তুলে ধরবেন। তারা প্রভাব বিস্তারকারী হবেন, প্রভাবিত হবেন না। তাদের বক্তব্য হবে সুস্পষ্ট, যেখানে থাকবে না পশ্চিমা সংস্কৃতির কাছে নতি স্বীকার। এর জন্য তারা সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যনসহ বিভিন্ন প্লাটফর্ম ব্যবহার করাবেন। নারীদের জন্য বিশেষ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে তার আওতায় নারী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স ও কর্মশালার আয়োজন করবেন।

৫. বিদ্যমান সমাজে নারীরা যেসব অন্যায় ও জুলুমমূলক আচরণের শিকার হং তার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং ইসলামি শরিয়াহর বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং ইসলামি শরিয়াহর আলোকেই তার সমাধান বাস্তবসম্মতভাবে পেশ করা। বিশেষত নির্দিষ্টভাবে যেসব নারী এমন পরিস্থিতির শিকার, কল্যাণ ও সংশোধনের মানসিকতা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের প্রতি হওয়া জুলুমকে নির্মূলে করে তাদের জন্য ইনসাফ নিশ্চিত করা।

৬. নারীদের অন্তরে আকিদাকে গেঁথে দেওয়া।
৭. দলবদ্ধভাবে কিংবা সংস্থারূপে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর ইসলামবিরোধ স্বার্থসমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং মুসলিম বিশ্বের ভেতরগত বিষয়ে সেসব সংস্থার অনুপ্রবেশকে না বলা।

৮. মুসলিম তরুণীদের হায়া, তহারাত ও পর্দার ওপর প্রতিপালন করা। নারীত্ব
ও মাতৃত্ব বিষয়ে ইলমি ও তরবিয়তি তৎপরতা বৃদ্ধি করা, যার মাধ্যমে নারীর
ও মাতৃত্বে তার ইবাদাত ও স্বভাবজাত দিকগুলো ফুটে উঠবে। বিশেষত মুসলিম নারীদের মাঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ও আনুগত্যকে গভীর করে তোলা।

৯. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

১০. মুসলিম নারীদের জন্য জরুরি হলো, উপনিবেশবাদী ও প্রাচ্যবাদী সংস্থাগুলে তাদের ওয়েস্টার্নাইজেশন তথা পশ্চিমায়নের জন্য যত চক্রান্ত আবিষ্কার করেছে সেগুলো ভালোভাবে চিনে নেওয়া এবং তাদের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে না দেওয়া।

১১. জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর যেই অসৎ উদ্দেশ্য, সেটাকে অনুধাবন করা। মুসলিম উম্মাহর জনশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের হুমকি ধমকিতে প্রতারিত না হয়ে, বরং আল্লাহর রাসুলের গর্বের ব্যবস্থা করা। নিজের সন্তানদের সৎ ও সাহসী মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং সেজন্য বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।

১২. নারীবাদী আন্দোলনগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে জানা এবং এগুলোর ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তোলা।

১৩. নারীদের নিয়ে প্রাচ্যবাদী গবেষণাসমূহের বিরুদ্ধে মুসলিমদের গবেষণা ও পর্যালোচনা তৈরি করা এবং সেগুলো মুসলিম নারীদের ভেতর ছড়িয়ে দেওয়া।

১৪. মুসলিম দেশগুলোতে কেবল নারীদের জন্য বিভিন্ন সংঘ, ইন্সটিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। যারা মুসলিম নারীদের পশ্চিমায়নের হাত থেকে বাঁচাতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও ইলমি প্রাচীর তৈরি করবে। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে প্রভাবিত মুসলিম বোনদের নীড়ে ফেরানোর জন্য পলিসি প্রস্তুত করবে এবং আধুনিক নারীবাদী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে নারীদের ভেতর জাগরণ সৃষ্টি করবে।

১৫. প্রত্যেক নারীকে তার সামাজিক দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে তোলা। যাতে সে পরিবার গঠনে এবং পরিবারের ও সন্তানদের লালনপালনে উত্তম অবদান রাখতে পারে। পাশাপাশি তাদের সমাজের নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের কাজের যোগ্য করে তুলতে হবে। কেননা আমাদের পরিবারগুলোকে, মায়েদের ও নারীদের তাদের প্রকৃত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পন্থা শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আর এই মহান সংস্কারমূলক কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই অধিকতর উপযোগী ও সক্ষম।২০

১৬. বিশেষভাবে সমাজের পুরুষদের একটি দায়িত্ব হলো, নারীর পারিবারিক মর্যাদা নিশ্চিত করা। নারীকে পশ্চিমা ভোগবাদী দর্শনের মতো নিছক উৎপাদক যন্ত্র হিসেবে না দেখা। বর্তমান সময়ে নারীদের পরিবার থেকে বের করার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি হলো, পরিবারে তার অবদান খাটো করা। অর্থনৈতিকভাবে কিংবা উপার্জনের দিক থেকে তার অবদানকে মূল্যায়ন না করা। পুরুষদের এই জঘন্য মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নারীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব নেওয়া পুরুষকর্তৃক নারীর ওপর কোনো প্রকার অনুগ্রহ নয়; বরং এটা তার আবশ্যিক দায়িত্ব। যা মহান আল্লাহ তাআলা তার ওপর ধার্য করেছেন। বড় দুঃখজনক ব্যাপার হলো, প্রকৃতি নারীকে সর্বাধিক মূল্যবান যে জিনিসট দিয়েছে সেটাই সে হারাতে বসেছে। সে জিনিসটি হচ্ছে তার নারীত্ব। এটা হারিয়ে সে সমস্ত সুখ-শান্তিও হারাচ্ছে। পরিবার হচ্ছে নারী-

পুরুষ উভয়ের স্বাভাবিক সুখের নীড়। মাতা ও গৃহিণীর তদারকি ছাড়া এই সুখের নীড় টিকে থাকতে পারে না। পরিবারই সমাজের ও ব্যক্তির সুখের উৎস। পরিবারই কল্যাণ, মেধাও প্রজ্ঞার সুতিকাগার।

আমাদের দুটো দর্শনের মধ্য থেকে যেকোনো একটাকে বেছে নিতে হবে। একদিকে রয়েছে ইসলামের দর্শন, যা নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রমের উৎকৃষ্টতম রক্ষক এবং যা তাকে স্ত্রী ও মা হিসেবে তার সামাজিক দায়িত্ব একাগ্রভাবে পালন করার সুযোগ দেয়। আর এরই বিনিময়ে সমাজকে তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে ও তার সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে বাধ্য করে। এজন্য ইসলাম স্বামীর ওপর কিংবা স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনের ওপর স্ত্রীর ও তার সন্তানদের ভরণপোষণের ভার অর্পণ করে। এতে নারীর অবমাননা কিংবা অবমূল্যায়নের প্রশ্নই ওঠে না। কেননা নারী সেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্বটা পালন করে, যা মানব জাতির সুখ-শাড়ি ও উন্নয়নের একমাত্র রক্ষাকবচ।

অন্যদিকে আছে পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুবাদী ও ভোগবাদী দর্শন। এই দর্শন নারীর জৈবিক দাবির ব্যাপারে তার ওপর কঠোর নিষ্পেষণ, নিপীড়ন চালায়। স্ত্রী ও মা হিসেবে তার স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তার নিজের জীবিকাগ্রচি নিশ্চিত করতে কঠোর পরিশ্রমে তাকে বাধ্য করে। তার নারীত্ব নষ্ট করে তাকে পা কিংবা যন্ত্রে রূপান্তর করে। এভাবে নারী নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার সন্তানরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা, সংহতি ও বন্ধন নিদারুণভাবে ব্যাহত হয়।

আমরা যারা মুসলিম, তাদের পক্ষে তো ইসলাম ও তার জীবন বিধানের চেয়ে অন্য কিছুকে অধিকতর কল্যাণকর মনে করা সম্ভবই না। কারণ মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'ওরা কি তবে জাহিলিয়াতের বিধিবিধান চায়? মুমিনদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে হতে পারে! শত্রুরা আমাদের ওপর যেই কৌশল বারবার অবলম্বন করে সফল হতে চাচ্ছে, আমাদের উচিত নয় তার মাধ্যমে প্রতারিত হওয়া। যেমনটা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুমিন কখনো একই ফাঁদে দ্বিতীয়বার খোঁকা খেতে পারে না। এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদিসে উদাসীন না থাকা এবং নিজেদের মেধা ব্যবহার করার নির্দেশনা আছে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا نِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. وَأَيْدِي

'আর তিনিই কিতাবিদের মধ্যে যারা কাফের, তাদের প্রথম সমাবেশেই তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছেন। (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কল্পনাও করোনি তারা বের হয়ে যাবে। তারাও মনে করেছিল, তাদের দুর্গগুলি তাদের আল্লাহ হতে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছে এমন দিক থেকে আসলেন, যা তারা ধারণাও করতে পারেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতিসঞ্চার করলেন। ফলে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে ফেলেছিল এবং মুসলিমদের হাতেও। সুতরাং হে চক্ষুষ্মানেরা, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো!

বর্তমানে মুসলিমরা যেসব আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে, তার সবগুলোর সূত্র আমরা আধুনিক ইতিহাসের সূচনালগ্নেই খুঁজে পাব। উনবিংশ শতাব্দীর সেসব আগ্রাসন আজও বহাল আছে। বদলেছে ভাষা, পাল্টিয়েছে নাম। আগে যেটা হতো প্রাচ্যবিদের নামে, এখন সেটা চলছে গবেষকের নামে। এখন উপনিবেশের নাম হয়েছে ওয়ার অন টেরর। আমরা যদি তাদের কর্মকৌশলগুলোর বাস্তবতা বুঝতে পারি, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের আগ্রাসনকে আমরা খুব সহজেই প্রতিরোধ করতে পারব। এজন্য এসব বিষয়ে আমাদের দায়ীদের মাঝে যথেষ্ট সচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং তাদের সমস্ত প্রকার আগ্রাসন নিত্রে নিজেদের মধ্যে গবেষণা চালু রাখতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম উম্মাহর মাঝে আমরা সচেতনার এক জোয়ার দেখতে পাচ্ছি। এই জোয়ারকে আরও বেগবানও মজবুত করতে হবে। যেন উম্মাহ বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সর্বপ্রকার বহিরাগত আগ্রাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে দীনের ছায়ায় জীবনযাপন করতে পারে। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর দাসত্বে জীবন পরিচালনার তাওফিক দান করুন। আমিন।

রেফারেন্স

১. ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২ - ডা. শামসুল আরেফীন শক্তি

২. বিহাইন্ড ফেমিনিজম - মারিয়াম তানহা।

৩. বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে বিবাহ ও নারীবাদ - মোঃ এনামুল হক

৪. আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে মুসলিম নারীসমাজ - হাসসান বিন সাবিত

৫. সমতাই কি জাস্টিস? ১,২ - ইয়াকুব আলী

৬. হিউম্যান বিয়িং- শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব - ইফতেখার সিফাত

৭. নারী ও হিজাব - ড. গওহার মুশতাক

৮. ফেমিনিজম সিরিজ - সিয়ান পাবলিকেশন

৯. সংশয়বাদ- মূল লেখক: ড্যানিয়েল হাকিকাতুজ
অনুবাদ: আসিফ আদনান

১০. উইকিপিডিয়া